: দ্বিতীয় অধ্যায় :

ঋতুর প্রকাশ বৈচিত্র্য :জীবনানন্দের কাব্যের দুই পর্ব

জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রকৃতি ভাবনার মধ্যে এসেছে নদ-নদী, গাছ, ফুল, ফল, পশু, পাখি, আকাশ, মাটি, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন জীব ও জড় উপাদান। শুধু জীবনানন্দ নয়, প্রকৃতি প্রেমী সমস্ত কবিকুল বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ঋতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রকৃতির চেহারার বদল ঘটে, তেমনি মানব মনের মধ্যেও আলাদা অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এক একটি ঋতু মানব মনে এক এক রকমের অনুভূতির সৃষ্টি করে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত ও বসন্ত প্রতিটি ঋতুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে কবি জীবনানন্দ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে কবিতার মধ্যে উপস্থিত করেছেন। প্রতিটি ঋতুর ক্ষণ, সময়কে তিনি নানা উপমা দিয়ে কবিতায় তুলে ধরেছেন। কখনো কখনো তিনি একটি কবিতায় একাধিক ঋতুর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সবমিলিয়ে ঋতুর বিচিত্র প্রকাশ জীবনানন্দের কবিতাকে স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছে।

ঋতুকেন্দ্রিক 'পাখিরা' কবিতায় পাখিগুলি যাত্রা শুরু করেছে শীত ঋতুতে, এবং পাখিগুলি ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে উপস্থিত হয়েছে বসন্তের রাতে। এখানে মূলতঃ কবি জানিয়েছেন, পাখির জীবনচক্রে শীত ও বসন্ত ঋতুর ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ —

"কোথাও রয়েছে পড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।
- -
আজ এই বসন্তের রাতে ....
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।"[১]

কালের নিয়মে কত ঋতু অতিক্রান্ত হয়। কবিও প্রিয়ার সন্ধানে পথ হেঁটে চলেন হাজার-হাজার বছর। ভাদরের ভিজামাঠ, আকাশের পউষ নীরবতা, হেমন্তের হিম মাখানো ঘাস, শরতের ভোর — বিভিন্ন ঋতুর আবেশ মাখিয়ে কবি তাঁর প্রিয়াকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। ধূ ধূ মাঠ, - ধানক্ষেত, - কাশফুল, - বুনোহাঁস, - বালুকার চর নানাদৃশ্যকে কবি দেখেছেন ঋতুর নবনব উপস্থিতির মধ্যে। জীবনানন্দ বলেছেন ঃ

"তার তরে কালে কালে পেতেছে সে শৈবাল বিছানা, - শাল তমালের ছায়া
এনেছে সে নব নব ঋতুরাগ, — পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া।"[২]
(যেদিন এ ধরণীর/ঝরাপালক,)

ঋতু বৈচিত্র্যের ফলে জগতে যে বিচিত্র পরিবর্তন দৃশ্যমান হয় তারই প্রতিফলন রয়েছে জীবনানন্দের কাব্যে।

জীবনানন্দের প্রথম সংকলন 'ঝরাপালক' (১৯২৭)। এই কাব্যে তিনি মূলতঃ নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী গ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের কঠিন ও কোমল সংবেদনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। 'বনলতা সেন' ও 'রূপসী বাংলা' কাব্যে তিনি প্রেম-প্রকৃতি-ইতিহাস-মৃত্যু-একাকীত্ব-ইত্যাদি চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, রহস্যময় সৌন্দর্যের জগতে পাড়ি দিয়েছেন। 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' গ্রন্থে প্রধানত মানব সভ্যতা ও মানুষের মধ্যে তীব্র নৈরাশ্যবোধকে অতিক্রম করার প্রয়াস দেখিয়েছেন।

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-১১০
২। তদেব;পৃ. - ৪৮

'ঝরাপালক' -এ জীবনানন্দ প্রকৃতির এক অপরূপ জগৎ নির্মান করেছেন। এখানে যা কিছু রয়েছে সবই গ্রামের পরিচিত দৃশ্য। তাঁর ঋতু চেতনায় গড়ে ওঠা প্রকৃতির সহজ উপাদান, যেসব ফুল-গাছ-পাখি-এসেছে সেগুলি পল্লীর জীবন্ত ছবি, পল্লীপ্রাণের উন্মুক্ত প্রকাশ হয়ে উঠেছে। কোন রকম জটিলতা এ কাব্যকে স্পর্শ করতে পারেনি। গ্রীষ্মের কালবৈশাখী, ডাহুকী পাখির আকুল গান, রৌদ্রতাপে অবনতমুখী মালঞ্চ কিংবা বর্ষায় 'বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি আঁধারে'[১] অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য এ কাব্যের মধ্যে রয়েছে। হেমন্তের হিম, বাসন্তী-উৎসব, শাঙনের মেঘ, ভাদ্রের ভিজা মাঠ - এমনই সহজ সৌন্দর্য্য রচনা করেছেন তিনি।

জীবনানন্দ তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে বিভিন্ন দৃশ্যের রূপকে অসাধারণ করে গড়ে তুলেছেন। চারিদিকের নানা দৃশ্যকে তিনি যেনএকটি সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। এরূপ দৃশ্যের পর দৃশ্যের অপূর্বতা দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ধূসর পাণ্ডুলিপির কবিতাগুলি 'রূপচিত্রময়'।

ঋতুকে আশ্রয় করে জীবনানন্দের ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্পষ্ট হয়েছে 'বনলতা সেন' কাব্যের বিভিন্ন কবিতাগুলিতেও। একাব্যে কবির প্রেম চেতনা এসেছে ঋতুর অনুষঙ্গে। বনলতা, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, সুদর্শনা, শ্যামলী, সবিতা- এই রক্তমাংসের প্রেমিকারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মতো রমণীয় ও চির আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কবি এই কাব্যে রোমান্টিক প্রেমের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে নানা ঋতুর উপমা ব্যবহার করেছেন।

ষড়ঋতুর সমাবেশ বাংলার বুকে লক্ষনীয়। কারণ কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর বাল্যজীবন কাটিয়েছেন বাংলাদেশে। বাংলার অনিন্দ্যনীয় সুন্দর রূপে মুগ্ধ হয়েছেন জীবনানন্দ। ঋতুর সমাবেশে রূপসী বাংলার প্রকৃতি তাঁর কাছে রমণীয় হয়ে উঠেছে। বাংলার নিশুতি জ্যোৎস্নার রাতে কবি শুনেছেন, "—টুপ্ টুপ্ টুপ্ সাররাত ঝরে শুনেছি শিশিরগুলো,"[২] (পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত)। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি তাঁর মৃত্যুকে পর্যন্ত কামনা করেছেন এই রূপসী বাংলার বুকেই। কবি যখন মৃত্যুর ঘুমে ঢলে পড়বেন, তখন কবি আশা করেন কবির শিয়রে উপস্থিত হবে বৈশাখী মেঘ। আরও আশা করেন, তিনি কাঁচপোকার মতো তুচ্ছ পতঙ্গের সঙ্গে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়বেন। আসলে এ জগৎ কবির কাছে অপূর্ব সৌন্দর্যের জগৎ। তিনি পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যকে দেখেছেন বাংলার মধ্যেই। বাংলার গাছ, পাখি, নদী, এমনকি বেহুলার মতো নারীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন অপরূপ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। মৃত্যুর পর বাংলার সমস্ত কিছুকে ভালোবেসে বাংলাতেই জন্ম নিতে চান কবি। 'রূপসী বাংলা' কাব্যে প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে দিন-মাস-বছরের পালা বদলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রঙিন চিত্র অঙ্কন করেছেন। কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা, বাদলের জলে পরিপূর্ণ ধলেশ্বরী নদী, পশমের মতো বিছানো লাল লাল বটের ফল, শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুল, শ্রাবণ মাসের কদম ফুল, কার্তিকের কুয়াশায় ঝরে পড়া ধান, শরতের রোদের বিলাস, চৈত্রের অন্ধকারে ক্ষুধিত চিল, আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামা-পোকা - প্রকৃতির বিভিন্ন রঙিন চিত্রগুলি ঋতুর অনুষঙ্গে 'রূপসী বাংলা'র বিভিন্ন কবিতায় তুলে ধরেছেন। 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে মূলতঃ তাঁর ভালো লাগার বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন। —

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-১৮
২। তদেব;পৃ. - ১২৪

"ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর সবুজ ঘাসের
থেকে; তাই রোদ ভালো লাগে - তাই নীলাকাশ
মৃদু ভিজে সকরুণ মনে হয়;- পথে পথে তাই এই ঘাস
জলের মতন স্নিগ্ধ মনে হয়;- মউমাছিদের যেন নীড়
এই ঘাস; .....
ভালো লাগে এই যে অশ্বত্থ পাতা আমপাতা সারা রাত ঝরে।"[১]

জীবনানন্দ এক অনন্য সাধারণ কবি। প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ। তাঁর জীবন বোধ প্রখর। যে জীবনানন্দ একসময় প্রকৃতির সৌন্দর্যে জীবনের উজ্জ্বলতা নির্মান করেছেন, তিনিই 'পৃথিবীর গভীর-গভীরতর অসুখ' এর ভয়ংকর রূপ দেখে নির্দেশ দিয়েছেন, 'মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি' দাঁড়াবার। জীবন ও মৃত্যু-দুই বিষয়কে ঋতুর রঙিন স্পর্শের বদলে জড়, প্রতীকী দোত্যনায় ব্যক্ত করেছেন। সভ্যতার ভয়াল রূপের মুখোমুখি হয়ে কবি 'মহাপৃথিবী' কাব্যের 'শ্রাবণরাত' কবিতায় পৃথিবীর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে ধূসররূপ প্রত্যক্ষ করেছেন।

'মহাপৃথিবী'র মতো 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' সংকলনের কবিতাগুলিতে প্রধানত চল্লিশের দশকের সেই অদ্ভুত সংশয়ের সময় উপস্থিত রয়েছে। 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন' - এসব কাব্যের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য। এই চারটি কাব্যগ্রন্থে অর্থাৎ আমরা জীবনানন্দের প্রথম পর্যায়ে লেখা কাব্যগুলির মধ্যে প্রকৃতির সহজ সরল রূপের বর্ণনা দেখতে পাই। কিন্তু পরবর্তী 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা-অবেলা - কালবেলা' এই দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখা গ্রন্থগুলিতে এসেছে জৈব হিংস্রতা, জান্তব সাহস, বন্য প্রকৃতি, পরাবাস্তবতা, ঋতুর খরতা, ক্লান্ত পৃথিবীর নানা প্রসঙ্গ। মূলত ঋতুর রমণীয় সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখা কবিতাগুলিতে।

"কোথাও হৃদয় নেই মনে হয়, হৃদয়যন্ত্রের
ভয়াবহভাবে সুস্থ সুন্দরের চেয়ে এক তিল
অবান্তর আনন্দের অশোভনতায়।
ইতিহাসে মাঝে মাঝে এ-রকম শীত অসারতা
নেমে আসে; —"[২]

জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রতিফলনের করুণ চিত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর ক্ষয়ক্ষতিতে পুঁজিবাদী দেশগুলি উপলব্ধি করে - যুদ্ধ নয়, ভিন্নতর পথে সাম্রাজ্যশক্তি বিস্তার করতে হবে। শক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিষ্ঠা করলো ঔপনিবেশিকবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক নীতির অপসারণ ঘটে। সরল, আদিম, পুরোনো পৃথিবীতে শুরু হয় বাণিজ্য বিস্তার এবং বিপনন পদ্ধতিতে নব্য পুঁজিবাদের প্রসারণ প্রক্রিয়া। সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে ভোগ্য পণ্যের বাজার ব্যাপক মাত্রায় প্রসারলাভ করে। বণিক, শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় প্রবেশ করে খোলা মদ, বেশ্যালয়ের মতো অবনত জীবনবোধ। যে জীবনানন্দ একদিন সমুদ্রের জলের বাতাসে হৃদয়ে সুস্থতা অনুভব করেছিলেন। সেই জীবনানন্দ সমুদ্রকে 'নীল মরুভূমি'তে পরিণত

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত; কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা; ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-১৪০
২। জীবনানন্দ দাশ; জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চম মুদ্রন : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৯৩

হতে দেখলেন। সাতটি তারা অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডল আলোকে পথের দিশারী। কিন্তু সেই সাতটি তারা আজ, তিমিরাচ্ছন্ন। স্বার্থান্ধ মানুষকে সাতটি তারা কোনভাবেই আলোকবর্তিকার নিশানাতে পৌঁছে দিতে পারছে না। হৃদয়ের মধ্যে শুধুই জিজ্ঞাসা জেগে উঠছে। কবি তাই পৃথিবীর সমস্ত তিমিরকে ধবংস করার লক্ষ্যে 'তিমির হননের গান' গেয়েছেন। সমস্ত কুশ্রীতাকে পেছনে ফেলে কবি পৌঁছে যেতে চেয়েছেন আলোর জগতে। —

"সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু —
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক "[১]

বিষয় ভাবনা অনুযায়ী জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থগুলিকে দুই পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। বিভাগটি এরকম ঃ

প্রথম পর্ব ঃ 'ঝরাপালক'
'ধূসর পাণ্ডুলিপি'
'বনলতা সেন'
'রূপসী বাংলা'।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ 'মহাপৃথিবী'
'সাতটি তারার তিমির'
'বেলা অবেলা কালবেলা'।

এখানে দুটি পর্বের ঋতুভাবনা ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করেছে। প্রথম পর্বে যেমন প্রকৃতিতে ঋতুর সাজবদলের অর্ন্তবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কবিতায় পাই দ্বিধাগ্রস্থ বিচ্ছিন্নতাবাদী যুগের চিত্র। ঋতুর এই প্রকাশ বৈচিত্র্য জীবনানন্দের কাব্যের দুই পর্বে ভিন্নরূপে রূপায়িত।

জীবনানন্দের প্রথম সংকলন 'ঝরাপালক' -এ তিনি ঋতুর প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। 'ঝরাপালক' -এর প্রথম কবিতায় রয়েছে বর্ষার প্রেক্ষাপট। রয়েছে বর্ষা ঋতুর জমজমাট প্রবেশ। কোন এক শ্রাবণ দিনের হিঙল-মেঘ, দাদুরীর ডাক, ভুঁই চাঁপা ফুল, শিরীষ ফুল, মাঝির ভাটিয়াল সুর - কেমন করে বর্ষা দিনের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করেছে তা কবি এখানে তুলে ধরেছেন। বর্ষণ মুখর এমন সুন্দর দিনে কবির সমস্ত কাজ অকাজে পরিণত হয়েছে। কবির মনে হয়েছে —

"কোন যেন এক সুদূর আকাশ গোধূলি লোকের তীর
কাজের বেলায় ডাকিছে আমারে, ডাকে অকাজের মাঝে!"[২]

শীত ও বর্ষা দুয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে 'নবনবীনের লাগি' কবিতায়। এখানে কবি ঝরাপালকের ঝড় দেখেছেন বাদলের রঙ্গমল্লীর মাঝে। নবীনের তীব্র মনের শক্তিকে ঝড়ের বাতাসের গতিবেগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সূর্য-চন্দ্রের আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার শক্তি রাখে ঝড়ের বাতাস। শ্মশান পথের ছাই, মৃত

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-২৩১
২। তদেব;পৃ. - ৩

অস্থির খুলি সরিয়ে নবীনেরা প্রাণের প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করে, বুকে কোটি কোটি দীপশিখা জ্বালিয়ে নবীনেরা ঘোষণা করে " — জয় মানবের জয়!"[১]

জীবনানন্দের 'ঝরাপালক' -এ সমকালের কবিদের মতো গতানুগতিক বিষয় নিয়ে লেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল - এঁদের কবিতার সংমিশ্রিত রূপ রয়েছে 'ঝরাপালকে'র অনেক কবিতায়। 'সিন্ধু' নামক কবিতা জীবনানন্দ ও নজরুল - দুই কবিই রচনা করেছেন। দুই কবিই সমুদ্রের অশান্ত গর্জন শুনেছেন। বিভিন্ন ঋতুর অনুষঙ্গ রয়েছে একবিতাগুলির মধ্যে। নজরুলের 'সিন্ধু' কবিতার পাটভূমিতে রয়েছে চারটি ঋতুর প্রেক্ষাপট — "কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত।"[২] (সিন্ধু/সিন্ধুহিন্দোল) জীবনানন্দের 'সিন্ধু' কবিতায় এসেছে — শীতের কুয়াশা, শিশিরের নিশা, আলোয়ার ভিজা মাঠ নানা দৃশ্যপটের ছবি। সমুদ্রের আনন্দমুখর ধ্বনি শুনে কবিও জীবনের জয়গান গেয়েছেন। —

"বৈশাখের বেলাতটে সমুদ্রের স্বর, —
অনন্ত, অভঙ্গ, অষ্ণ, আনন্দসুন্দর!
তারপর, দূরপথে অভিযান বাহি
চলে যাব জীবনের জীবনের জয়গান গাহি"[৩]

'ঝরাপালকে'র চারটি কবিতায় গ্রীষ্ম ঋতুর প্রেক্ষাপট ব্যবহার করা হয়েছে। 'নাবিক', 'সিন্ধু', 'দেশবন্ধু' ও 'ডাহুকী. - এই কবিতাগুলিতে গ্রীষ্ম ঋতুর উষ্ণ, তপ্ত পরিবেশের সঙ্গে মানব মনে আলাদা অনুভূতির সুর বেজে উঠেছে। স্বদেশ বিষয়ক একটি কবিতা 'দেশবন্ধু'। এ কবিতায় কবি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দুর্নিবার বিপ্লবী শক্তির অফুরন্ত উচ্ছ্বাসকে অশান্ত কালবৈশাখীর দুর্দম শক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেশবন্ধু প্রসঙ্গে বলেছেন, "কালবৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইত রক্তপুঞ্জ তব / উত্তাল উর্মির তালে, —"[৪]।

জীবনানন্দ গ্রীষ্ম ঋতুর ছবি অঙ্কন করেছেন 'ডাহুকী' কবিতায়। গ্রীষ্মের নিরালা দুপুরে ডাহুকীর ডাক শুনে কবির মনে হয়েছে, এ যেন বিরহিনী নারী হৃদয়ের ক্রন্দন ধ্বনি। যা নিস্তব্ধ পল্লীর বুকে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠেছে। বিরহিনী ডাহুকীর কান্নার মধ্যে হৃদয়ের কোন গোপন কথা রয়েছে। তা ছাড়া এ কবিতায় গ্রীষ্মের আকাশ-ফুল-পাখির বর্ণনা রয়েছে।

মানব জীবন প্রধানতঃ পঞ্চ দশার মধ্যেই পূর্ণতা পায়। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য - এই পঞ্চ দশার অন্যতম হল কৈশোর কাল। কৈশোরের গতিপ্রকৃতিকে কবি জীবনানন্দ শরতের ম্লান-মধুর-শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিশোর কালে জেগে ওঠেনা হৃদয়ের বিষবহ্নি বাসনা। উল্লসিত হয় না যৌবনের দুরন্ত জলধি কিংবা "কক্ষচ্যুত উল্কাসম পড়েনিকো স্খলি"[৫]। শরৎ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে কবির কৈশোরের মন —

"ধবল কাশের দলে, আশ্বিনের গগনের তলে
তোর তরে রে কিশোর, মৃগতৃষ্ণা কভু নাহি জ্বলে!
নয়নে ফোটেনা তব মিথ্যা মরুদ্যান।
অপরূপ রূপ - পরীস্থান
-দিগন্তের আগে
তোমার নির্মেঘ চক্ষে কভু নাহি জাগে!"[৬]

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ৪
২। তদেব;পৃ. - ২৮
৩। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ১৪২
৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ২৯
৫। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৯১৫
৬। তদেব;পৃ. - ৯১৫

কবি 'বেদিয়া' কবিতায় শরৎ ঋতুকে রূপবতী রাণীর মতো করে সাজিয়েছেন। শরৎ ঊষার অমল আলোয় বেদিয়া বেরিয়েছে তার বহু পুরাতন পরিচিত সঙ্গীর খোঁজে। নিরুদ্দেশের পথে বেদিয়া চলতে চলতে যত্ন করে কানে পরেছে বনফুল। কুড়িয়ে পেয়েছে পালক। বেদিয়া "রতন-মনি-মঞ্জুষা-হীরে-মাণিকের দুল সে চায়না।" চায় শরৎ প্রকৃতিকে —

"— তার চেয়ে ভালো অমল ঊষার কনক - রোদের সিঁথি,
তার চেয়ে ভালো আলো-ঝলমল শীতল শিশির - বীথি, ...।"[১]

ঘুঘু-হরিয়াল-ডাহুক-শালিক-গাঙচিল-বুনোহাঁস এসব পাখিরা নিবিড় কাননে, কখনো তটিনীর কূলে কূলে ডেকে বেড়ায়। বাবলা বনের মৃদুল গন্ধের সঙ্গে সীমান্তে মিশে যায় শরৎ-ঊষার শ্বাস-প্রশ্বাস। যুগ-যুগান্তর ধরে ঊষার-ধূসর বালুকা পথ বেয়ে চলে বেদিয়া। বেদিয়ার পথ চলার সঙ্গে প্রকৃতিও যোগ দিয়েছে। 'বেদিয়া'তে কবি জানিয়েছেন, —

ক) 'যুগযুগান্ত কত কান্তার তার পানে আছে চেয়ে',
খ) 'তারি প্রতীক্ষা মেগে বসে আছে ব্যাকুল বিজন মরু'।
গ) 'আকাশ-বাতাস-আলোক-আঁধার মৌন স্বপ্নভরে,
মনে হয় যেন নিখিল বিশ্ব কোল পেতে তার তরে'!

"একদিন খুঁজেছিনু যারে —" কবিতায় একাধিক ঋতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কবি প্রিয়ার সন্ধানে পথ-যাত্রা করে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকেই যেন একান্তভাবে অনুভব করেছেন। বাদলের গোধূলি-আঁধারে কবি দেখেছেন বকের প্রস্ফুটিত পাখার ভিড়। এসেছে প্রকৃতির রঙে-গন্ধে ভরা দৃষ্টি মনোহরণকারী ফুলের দল। মালতী লতার বনে, কদমের তলে, কেয়া ফুল, শেফালির দলে, কামিনীর ঝরা পাপড়ির সঙ্গে অনুভব করেছেন প্রিয়ার বিরহ। শরতের ভোরে, হেমন্তের হিম ঘাসে, পউষ-আকাশের নীরবতায়, ভাদরের ভিজা মাঠে - বিভিন্ন ঋতু-মাস-ক্ষণ অতিক্রম করে কবি তাঁর প্রিয়ার সন্ধান করেছেন। যেমন করে রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন, —

"আমি তারেই খুঁজে বোড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে বলে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুলে ফুটে রয় বনে আমার বনে।"[২]

হেমন্তের হিম ঘাসের উপর ঝরে পড়া কামিনীর মতোই প্রিয়াহীন হয়েছে কবির হৃদয়। ব্যথিত হয়েছেন তিনি। আবার হেমন্তের হিম পথ ধরেই আলেয়ার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। পল্লীর সৌন্দর্যের মধ্যেই আলেয়ার আশ্চর্য লীলা দেখেছেন তিনি। অধরা আলেয়ার আলোকে ভালোবেসে ফকির তার নিরাসক্ত অতিক্রম করে চলেছিল। ঘোমটায় আঁখি ঘিরে কুমারী, রাত্রিতে আলেয়ার পথে যাত্রা করেছিল। আলেয়ার আলোয় অভিসারিকা "ভাঙা হাটে, — ভিজা মাঠে, — মরণের পাণে শীত প্রেতপুরে/একা একা মরিতেছ ঘুরে!"[৩] যুগে যুগে জন্মে জন্মে চলেছে এ অভিসার। কবি বলেছেন —

---

১. জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ১২২
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী;কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৯৬
৩. জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৯৩৩

"রাত্রি - পারাবারে
ফিরিতেছ বারম্বার একাকী বিচরি!
হেমন্তের হিম পথ ধরি,
পউষ আকাশতলে দহি দহি দহি
কত শত যুগজন্ম বহি!"[১]

'ঝলাপালকে'র কয়েকটি কবিতায় হেমন্ত ঋতুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হেমন্তের অসাধারণ একটি চিত্রকলা বর্ণনা করেছেন 'কবি' কবিতায়। হেমন্ত ঋতুর প্রতি কবি যে বিশেষ অনুরাগী -এ কবিতা তারই অন্যতম পরিচয় রেখেছে। 'কবি' কবিতায় কবিমন প্রসারিত হয়েছে হেমন্তের হিম মাঠ থেকে সীমাহীন আকাশ পর্যন্ত।

"হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূটির মতো কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে।"[২]

এই কবিতায় কবি এক বিরহী প্রেমিকের হৃদয়ের বেদনার কাহিনী লিখেছেন। কবি তাঁর মানসীর ছবিকে প্রত্যক্ষ করেছেন প্রকৃতির নানা উপাদানের সঙ্গে। পৃথিবীর পসরার মাঝে সকল চেনা মুখের ছবি দেখতে পেলেও বিরহী কবি তাঁর মানসীকে খুঁজে পান নি। কবির কাছে তাঁর মানসী চিরকালই অজানা থেকে গেছে। প্রকৃতির নানান দৃশ্যের মাঝে মানসীর আভাস - সুর কবি শুনতে পেলেও পূর্ণভাবে মানসীকে কখনো ধরতে পারেননি। ঘাসের বুকে শিশিরের সঙ্গে মিশে থাকতে দেখেছেন মানসীর অসাধারণ রূপসৌন্দর্য্যকে। করবী কুঁড়ির পানে চেয়ে কবি তাঁর মানসীর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। মানসীর রূপ কখনো কখনো কবির কল্পনায় মাঠে ঝরে পড়া হেমন্তের হিম রূপে ধরা দিয়েছে। কবি রূপী বিরহী প্রেমিক তার সুর উপলব্ধি করেছেন - পউষ নিশার পুবালি হাওয়াতে। ঘুঘুর, জল ডাহুকীর মুখে কখনো কখনো সেই সুরকে শুনেছেন। কখনও বা দুপুর আকাশে, হলুদ পাতার ভিড়ে, ঝরা পাতা ভরা মরা দরিয়ার পাশে সেই সুর শুনেছেন। কবি মানসীকে রাতের মাঠে আলস্যে, অকাজের সঙ্গে হেঁটে বেড়াতে দেখেছেন। টুনটুনি, মধুমাছি, ঘাসের সঙ্গে মানসীকে আকাশের নীচে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছেন। যখন বাঁকাচাঁদ বাদলের মেঘের আঁধারে ডুবে যায়, তেঁতুলের শাখায় শাখায় কালো ডানা প্রসারিত করে বাদুড়েরা, নদীর মুকুরের উপর দিয়ে উড়ে যায়, জোনাকিরা ফুট ফুট জ্বলে ওঠে - তখনই কবি দেখতে পেয়েছেন প্রিয়ার চোখ। কবির ভাষায়, — "জ্বলে ওঠে আলেয়ার মতো তার লাল আঁখিখানি।"[৩]

হেমন্ত ঋতুর নানা চিত্রকল্পের সঙ্গে কবির চেতন - অবচেতন মনের নানা অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় নিহিত রয়েছে। 'শ্মশান', 'পিরামিড', 'দক্ষিণা', 'সেদিন এ ধরণী', 'ওগো দরদিয়া' 'ঝরাপালকে'র এ কবিতাগুলিতে উপস্থিত রয়েছে হেমন্ত ঋতু। জীবনানন্দের সমকালে উপস্থিত যুগসংকটকে শ্মশানের চিতার আলো ও রাত্রির সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'পিরামিড' একটি প্রেমের কবিতা। পাতাঝরা হেমন্তের গোধূলি পার হয়ে 'মাধবীর গান' - কবি শুনিয়েছেন এখানে। মিশরীয় স্মৃতি স্তম্ভ পিরামিডের মধ্যে অতীত কল্পনাচারী জীবনানন্দ প্রিয়ার আহবান শুনতে পেয়েছেন। কবি কখনই মৃত্যুর ধূসর মুখ দেখতে চান নি। তাই হেমন্তের

১। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড)/বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩/পঞ্চম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৮৬/পৃ. - ৯৩৩
২। তদেব;পৃ. - ১৪০
৩। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ/অবসর প্রকাশনা;ঢাকা-১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-৩৩

ঝরাপাতাকে বিদায় জানিয়ে কবি প্রাণের বন্দনা করেছেন। যেমন করে রবীন্দ্রনাথ 'শাজাহান' কবিতায়, নজরুলের 'নারী', কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'তাজ' কবিতায় পাথরের জড়ত্ব নয়, প্রাণের জয়গান গেয়েছেন।

হেমন্তের একটি বিশেষ ফুল 'মাধবী'। তিনি মাধবী ফুলের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন 'শ্মশান' কবিতায়, —

"কুহেলির হিমশয্যা অপসারি ধীরে
রূপময়ী তন্বী মাধবীরে
ধরণী বরিয়া লয় বারে বারে বারে!"[১]

শুধু ধরণী নয়, কবি জীবনানন্দ ও হেমন্ত ঋতুর মাধবীকে কবিতায় একাধিকবার গ্রহণ করেছেন। 'দক্ষিণা' কবিতায় মাধবীকে পেয়েছেন, "আজ মাধবীর প্রথম ঊষায়, — দক্ষিণা হাওয়ার শ্বাসে।" হেমন্তের নিসর্গ প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য রয়েছে 'সে দিন এধরণীর' কবিতায়। দৃশ্যটি এরকম ঃ "ডেকেছিল ভিজে ঘাস, — হেমন্তের হিমমাস, জোনাকির ঝাড়!" সেই দিনই কবির মনে ঋতুর প্রতি গাঢ় অনুরাগ জন্মেছিল। ধরণীর বুকে সবুজ ছায়ায় উতরোল তরঙ্গের ভিড় দেখে কবি অভিভূত হয়েছেন। সমস্ত ঋতুকালের আবর্তন শেষ করে কবি উপনীত হলেন বসন্ত ঋতুতে। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফাল্গুনের মিলন মাসে প্রকৃতির বুকে শৈবাল বিছানা পাতা থাকতে দেখেছেন, — "শালতমালের ছায়া/ এনেছে সে নব নব ঋতুরাগ, — পউষ নিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া!" রবীন্দ্রনাথও এই বসন্ত ঋতুর অপেক্ষা করেছিলেন, "দিন শেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল বলে / তাই নিয়ে বসে আছি বীণাখানি কোলে / তারই সুর নেব ধরে / আমারি গনেতে ভরে/ ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে।"[২] এই বসন্তকে রবীন্দ্রনাথ 'ধরণীর - ধ্যানভরা ধন' বলেছেন। রবীন্দ্রকাব্যের ঋতুভাবনার যে পরিচয় বাংলাসাহিত্যে রয়েছে তাঁর থেকে জীবনানন্দের ঋতুভাবনা কোন অংশেই কম স্বতন্ত্র নয়। কবিতা লেখার পথে জীবনানন্দ 'মহাবিশ্ব লোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময় চেতনাকে'[৩] তাঁর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার 'সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্য'[৪] হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 'ঝরাপালকের' শুরু থেকেই কবির সৃষ্টিশীল সমস্ত কাব্য ভুবনে সময় চেতনার ইঙ্গিত রয়েছে। 'ঝরাপালকে'র শেষ কবিতায় দেখা যায় ঝরাফসলের গান। আসলে প্রকৃতির কাছে বাঁধা কবিমন শুধু ফসলের শূন্যতাকে নয়, পূর্ণতাকেও গ্রহণ করেছে ঃ

"চোখ দুটো ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে!"[৫]

জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্য 'ধূসরপাণ্ডুলিপি' তে রয়েছে ঋতু চিত্রনের অভিনবত্ব। এখানে শহুরে পরিবেশের ঠিক উল্টো পিঠের চিহ্ন রয়েছে। অর্থাৎ শুধু গ্রাম্য প্রকৃতির চিত্রকল্প এখানে এঁকেছেন কবি। কাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনার অদ্ভুত অনুভূতি আবিষ্কার করেছেন জীবনানন্দ - যা পূর্ব কাব্য 'ঝরাপালকে' ছিল না। বলা যায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সংকলনই তাঁর প্রতিষ্ঠার যথার্থ সোপান। এ কাব্য পেয়েই জীবনানন্দকে বুদ্ধ দেব বসু অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন 'নির্জনতম কবি', 'প্রকৃতির কবি'[৬]। এ কাব্যের কবিতাগুলির নতুনত্ব দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ... 'তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-৩৬
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গীতবিতান / বিশ্ব সাহিত্য ভবন ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৪২
৩। কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ / সিগনেট প্রেস ঃ কলকাতা-২৩ / দশম সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৩ / পৃ. - ৬৬
৪। তদেব;পৃ. - ৪২
৫। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-৩৬
৬। বুদ্ধ দেব বসু, কালের পুতুল / নিউ এজ, ১৯৯৭, মে / কলিকাতা - ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২৮

আছে'।

শুধু ঋতুর উপস্থিতি নয়, ঋতুর প্রতি অনুরাগ এবং ঋতুর মধ্য দিয়ে কবিমনের আবেগ প্রকাশ জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যায়। ঋতুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে রঙের ও বিচিত্র প্রকাশ পাঠককে বিস্মিত করে। যেন তুলি ও রঙ নিয়েই জীবনানন্দ কবিতায় ঋতুর রূপের বাহার এঁকেছেন। এক আশ্চর্য্য অনুভূতি দিয়ে কবিতায় ঋতুর রঙের সঙ্গে জীবনের রঙকে পরিস্ফুট করেছেন জীবনানন্দ। — একাব্যের রূপরসগন্ধস্পর্শের ইন্দ্রঘন অনুভূতি ইয়েটসের লেখাতেও পাওয়া যায়। ইয়েটসের 'The Falling of the Leaves' -এর 'Yellow the leaves of the rowan above us and yellow the wet wild strawerry leaves' [১] -এর সঙ্গে তুলনীয় — "দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ।"[২]

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রথম কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর'। একবিতায় রয়েছে মৃত্যুর অনুষঙ্গ। মৃত্যুর প্রতীকী ভাবনায় এসেছে শীতঋতু। পৃথিবীর ঋতুচক্রের ঘূর্ণাবর্তে কবির জীবন অতিক্রান্ত হয়েছে। কবি তাঁর মানসীকে নানা ঋতুকাল ধরে অন্বেষণ করেছেন। অসীম নীল আকাশে নক্ষত্রের সঙ্গে প্রিয়াকে বিচরণ করতে দেখেছেন। কবির জীবনের স্বাদ, শান্তি, সমস্ত গান সবই ওই মানবীকে ঘিরে রচিত হয়েছে। কিন্তু কবি যেদিন হেমন্তের মতো পৃথিবী থেকে ঝরে পড়বেন শীতরূপী মৃত্যুর কোলে — তখন কি কবির প্রিয়া তাঁর সঙ্গী হবেন? — এমন জিজ্ঞাসা 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতার মধ্যে রয়েছে। এমন গভীর জিজ্ঞাসা এর আগে কোন কবির লেখায় পাওয়া যায়নি, —

"হেমন্তে ঝড়ে আমি ঝরিব যখন —
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের' পরে শুয়ে রবে? — অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
তোমরা আকাশ - আলো - জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?"[৩]

কবিতার শিরোনামই কবির জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর। কেউই কারোর চিরসাথী হতে পারে না। জীবনানন্দ একমাত্র কবি, যিনি এর যথার্থ দার্শনিক উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

'মাঠের গল্প' কবিতার প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে মিশেছে প্রতীকী অনুষঙ্গ। যেমন, - মেঠো চাঁদ ও পোড়ো জমি। এখানে চাঁদ সফলতা এবং পোড়ো জমি নিষ্ফলতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'মাঠের গল্প' কবিতার 'মেঠোচাঁদ', 'পেঁচা', 'পঁচিশ বছর পরে' এবং 'কার্তিক মাঠের চাঁদ' — এই কবিতাংশগুলিতে প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে uncanny। গভীরতম সত্যের কাছে পৌঁছাতে হলে এ কবিতার পাঠককে অতি প্রাকৃত ও রহস্যময় মানবচেতন অবচেতন -এর জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। চাঁদ সবসময় কবিতায় রোমান্টিক জগৎ -এর সৌন্দর্য্যের প্রতীকরূপে নির্মিত হয়ে এসেছে। অনেকটা ইয়েটসের 'UNDER THE MOON' কবিতার 'moons light'[৪] এর মতো। সৌন্দর্যের ধারক চাঁদ পরবর্তী কবিতাংশে অভিশপ্ত সৌন্দর্যহীনতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে চাঁদের সঙ্গে মানবাত্মার দূরত্ব রচিত হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতা এই সত্যের প্রমাণ দেয় যে, অতীত যুগের সৌন্দর্য পিপাসু মনটি আধুনিক যুগে, বিজ্ঞান দিয়ে সাজাতে গিয়ে প্রকৃতি সৌন্দর্যের অনুভব হারিয়ে ফেলেছে। মেঠো চাঁদ

১। A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry/Radha Publishing House; Calcutta/Indian Edition-2008/Page No. - 85
২। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১১২
৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৫
৪। A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry/Radha Publishing House; Calcutta/Indian Edition-2008/Page No. - 39

যেমন মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে তেমনিই মানুষ ও মেঠো চাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করছে। তাই জমি থেকে ফসল কেটে নেবার পর জমিতে তৈরি হয়েছে ফসল হারানোর ভয়াবহ শূন্যতা। যে শূন্যতা থেকে রূপ নিয়েছে পোড়ো জমি। বারবার ফসল উৎপাদনের আক্রমনে পৃথিবীও হয়েছে বুড়ি অর্থাৎ উর্বরতাহীন। তাই মাঠের চারিপাশে দেখা যাচ্ছে খড় নাড়া, হলুদ লতা মিশ্রিত পোড়ো জমি। মহাপ্রকৃতির শূন্যতায় পৃথিবী যেন আজ ঝিমিয়ে পড়েছে।
জীবনানন্দ লিখেছেন —

"ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝরে কত, —
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো!
ক্ষেতে-ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতবার, — কতবার ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে, — চলে গেছে কবে। —
শস্য ফলিয়া গেছে, — তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা-একা! — ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি - খড়-নাড়া — মাঠের ফাটল, —
শিশিরের জল!"[১]

'মাঠের গল্প' কবিতাংশের দ্বিতীয় অংশ পেঁচাতে সৌন্দর্যের পাশাপাশি পৃথিবীর মলিন চেহারার বর্ণনা রয়েছে। কার্তিক কিংবা অঘ্রাণের রাতের আকাশে কবি যেমন দেখেছেন চাঁদ ও তারার ছবি, তেমনি পাশাপাশি বাঁশপাতা, মরা ঘাস, ধোঁয়াটে, কুয়াশা এবং ঘুমন্ত পৃথিবীর ছবিও দেখেছেন। 'পঁচিশ বছর পরে' কবিতায় জীবনানন্দ দেখিয়েছেন সৌন্দর্যের দু-একটি ধবংসাত্মক ছবি - চড়ুয়ের ভাঙা বাসা, পথের উপর পাখির ডিমের খোলা ঠাণ্ডা-কড়কড় হয়েছে। নষ্ট শসা, শুকনো মাকড়সার ছেড়া জাল ইত্যাদি ধবংসের ছবিকে বাস্তবায়িত করেছে। শেষ কবিতাংশে কবি জীবনানন্দ জীবনকে সহজ স্বচ্ছ পথে পরিচালিত করেছেন। আকাশের বুকে আর কোন মেঘ নেই, নক্ষত্র জ্বলে উঠেছে। কবির হৃদয়ে আবার জেগে উঠেছে আবেগ। কবি দেখলেন কার্তিকের মাঠের শিয়রে চাঁদ ফুটে উঠেছে। জীবনের স্বাদ নিয়ে কবির মতো চাষারাও সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর চারদিকের তারা মাঠ নিড়িয়েছে, শস্যের ক্ষেতগুলিকে তারা নতুন করে চষেছে।

'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা। এই কবিতায় মৃত্যুচেতনা ও জীবনবোধ দুইয়ের প্রকাশ রয়েছে। কবির স্মৃতিচারণ ঘটেছে এখানে। কোন একদিন শীতার্ত সন্ধ্যায় নির্জন মাঠের উপর তিনি হেঁটেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন কুয়াশারূপী নারী, ফুল, নদী, চাঁদ ও জোনাকিকে। হৃদয়ের কোমলতা দিয়ে প্রকাশ করেছেন জীবনবোধের এই প্রসঙ্গগুলি। এ কবিতার আটটি স্তবকেও প্রকৃতির বর্ণবহুল চিত্র উপস্থাপন করেছেন জীবনানন্দ। 'মৃত্যুর আগে' অর্থাৎ জীবনের শেষ মুহূর্তে কাহিনী লিখেছেন এ কবিতায়। ঋতুচক্রের অনিবার্য নিয়মে হেমন্তের পর শীত এসে উপস্থিত হয়। হেমন্তের পর শীতের আগমনের মধ্যে মৃত্যুর শীতলতা রয়েছে। ফসল কাটায় ফসলের মৃতু, শীতের নদীতে মৃত্যুর ধূসর কুয়াশা, সূর্যডোবার পর সন্ধ্যার আবছা ধূসর মৃত্যুঘন পরিবেশ, অঘ্রাণের অন্ধকারে সবুজপাতা হলুদপাতা হয়ে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী পথে ঢলে পড়েছে — এগুলি সবই প্রাকৃতিক শূন্যতার ছবি, জীবন নিঃশেষ হওয়ার ছবি। এখানে আমরা ইয়েটস -এর 'The falling of the leaves' কবিতার সাদৃশ্য খুঁজে পাই ঃ

"Autumn is over the long leaves that love us,
And over the mice in the barley sheaveas;
Yellow the leaves of the roean above us
And yellow the wet wild – strawberry leaves."[২]

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ৫৭
২। A. NORMAN JEFFARES : Yeats Selected Poetry/Radha Publishing House; Calcutta/Indian Edition-2008/Page No. - 85

শুরুতেই তিনি বলেছেন, 'Autumn is over' — শরৎ ঋতুর বিদায় মানেই প্রকৃতিসংলগ্ন মানবমনে শূন্যতার সঞ্চার ঘটেছে। শিশির পড়বার পর স্ট্রবেরি পাতা ক্রমে হলুদে পরিণত হয়েছে। জীবনানন্দের ভাবনায়ও তাই দেখা যায় ঃ

"দেখেছি সবুজপাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ ....."[১]।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দেখেছিলেন 'শ্যাম-সমান'। "অনেকে মৃত্যুর অনেক আগেই আলো অন্ধকার চিনবার ক্ষমতাটাকে হারিয়ে ফেলে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনি 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় মৃত্যুকে জীবনের মাধ্যমে এবং জীবনকে মৃত্যুর মাধ্যমে প্রতিফলিত করলেন। এই কবিতায় জীবনের সংরাগকে প্রতীয়মান করে তুলেছে প্রাণীজগতের স্পন্দন এবং উদ্ভিদজগতের মধুরতা। আর প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিদজগতের মাঝখানে বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে এমন একটি মেয়ে, যে মৃত্যুর ধারণা বহন করছে বলেই জীবনানন্দ তাকে ছড়িয়ে দিলেন মর্ত্য বিশ্বের সর্বত্র। এই মেয়েটি প্রাণীদের মধ্যে, উদ্ভিদদের মধ্যে, ঘুরতে ঘুরতে আলো ও অন্ধকারের চিরকালীন দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করেছে। এই দ্বন্দ্বে দেখা যাচ্ছে কুয়াশা এবং পউষ মৃত্যুর চিহ্নবাহী। কিন্তু হাঁস এবং ফুল স্পষ্টত জীবনের সংকেতবাহী।"[২]

জীবনানন্দের মৃত্যুবোধ জীবনে শান্তির মতো - পল্লী জীবনটা তাঁর কাছে 'ধানের গুচ্ছের মতো সহজ সবুজ'। শীতের শব্দহীন সন্ধ্যায় প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে কবি দেখেছেন অনুপম চিত্র - যে চিত্র সম্পূর্ণই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাছাড়া এই কবিতায় রয়েছে ঋতুর কতকগুলি প্রসঙ্গ ঃ

ক) 'আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়'

খ) 'আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভালো'

.....

বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, —

গ) 'শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে-ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারো-মাস';

ঘ) 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ',

ঙ) 'ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ',

চ) 'বাতাস ঝিঁঝিঁর গন্ধ — বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে';

ছ) 'আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হলে পর'[৩] — সংবেদনশীল কবিমন প্রকৃতির রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ মেখে মৃত্যুর ধূসরতায় জীবনকে আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বারোমাসের বর্ণবহুল নৈসর্গিক চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। যেমন ঃ

১ম স্তবক — পউষ সন্ধ্যায় নির্জন খড়ের মাঠে হাঁটা, নদীর মৃদু কুলুধবনি, পাড়াগাঁর রমণীরা, আকন্দ ধুন্দুলবনে জোনাকি, নির্জন মাঠে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো।

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-১১২

২। জহর সেন মজুমদার;জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য/মডেল পাবলিশিং হাউস;কলিকাতা - ৭৩/ প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৪০৫, পৃ. - ৩১৫

৩। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-১১২

২য় স্তবক — খড়ের চালে বুড়ো পেঁচা, অশথের ডালে বসে থাকা বক।

৩য় স্তবক — নম্রনীল দিগন্তের জ্যোৎস্নায় উড়ন্ত বুনোহাঁস, ধানের গুচ্ছে হাতে কৃষক, শিশুর প্রিয় মুখ, সন্ধ্যায় কুলায় প্রত্যাশী উড়ন্ত কাক ,ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র আকাশ।

৪র্থ স্তবক — হিজলের সবুজ পাতায় অঘ্রাণে হলুদ রঙধরা, শীতের রাতে চালের খুদগায়ে মেখে ইঁদুরের ছুটোছুটি করা, রূপালী মাছের চোখ, পুকুরের পাড়ে ডানার জল ঝাড়তে থাকা হাঁস, সন্ধ্যায় হাঁসকে দুহাতে ধরে সস্নেহে আদররত কিশোরী।

৫ম স্তবক — শীতের আকাশের উচুঁতে ভাসমান মেঘের নীচে উড়ন্ত সোনালী চিল, বেতের লতার নীচে বানানো বাসায় চড়ুই পাখির ডিম, খড়ের চালে ও উঠানে পড়া জ্যোৎস্নার আলো, বৈশাখের ঝিলমিল করা রোদ, সবুজে ভরা প্রান্তর।

৬ষ্ঠ স্তবক — বটগাছের নীচে ঝরে পড়া অজস্র লাল রঙের ফল, স্বচ্ছ জলের প্রবাহিত নদী, নীল আকাশ, সুপারি গাছের সারি, সবুজ ধানের গুচ্ছ।

৭ম স্তবক — প্রতিদিনের চেনা আলো, ধূসর বিকেলবেলা, ক্ষীণ ধোঁয়া ওঠা ম্লান ধূপকাঠি।

৮ম স্তবক — মৃত্যুশয্যাশায়ী এক মানুষের মুখে মৃত্যুর ধূসরছায়া, সূর্য ডোবার পর ধূসর-আবছায়া পরিবেশ, প্রান্তরের কুয়াশা পেরিয়ে উড়ে যাওয়া কাক।

এ কবিতায় চিত্রের সঙ্গে শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের নিবিড় অনুভূতির যোগ রয়েছে। — গন্ধঃ পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ, শিশুর মুখের গন্ধ, চালের ধূসর গন্ধ, ঘুমের ঘ্রাণ, নরমজলের গন্ধ, বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ।
শব্দ ও স্পর্শ ঃ খড়ের উপর হাঁটার শব্দ, নদীর মৃদু কুলুধবনি, পেঁচার ডানার সঞ্চারের শব্দ, অশ্বত্থের ডালে ডালে বকের ডাক, শিকারীর গুলি ছোঁড়ার শব্দ, হাঁসের উড়ার শব্দ, বুলবুলি, পাখপাখালীর ডাক, মেঘ আর সোনালী চিলের ডাক।

জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম সংখ্যাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত সংবলিত পত্র। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন — 'জীবনানন্দের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'[১] রবীন্দ্রনাথ আক্ষরিকভাবেই এ কবিতার অভিধা দিয়েছেন 'চিত্ররূপময়'। বারো মাসের ক্রম তরঙ্গ যুক্ত হয়েছে কবিতার নানা দৃশ্যপটে। নানা দৃশ্যের সঙ্গে এসেছে প্রেমানুভূতি। স্বাভাবিকভাবেই এসেছে নারীর কথা। জীবনানন্দের এই নারী প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক আরও বলেছেন, —

> "প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের মধ্য দিয়ে ভোর বিকেল - সন্ধ্যা-রাত্রির প্রেম-তরঙ্গ একদিকে খুলে দিয়েছ অগাধ জীবনের প্রেক্ষাপট, যার সঙ্গে রয়েছে মানুষের গাঢ় ইন্দ্রিয় সংবেদনার যোগ। এই ক্রম-তরঙ্গ নিয়েই বারোমাসের মুগ্ধতা। জীবনানন্দের নিবিষ্ট আস্বাদন এই ক্রম-তরঙ্গের নাগাল এড়িয়ে দেখতে পায় সবকিছুর ওপর নেমে আসছে একটা ঘুমের ঘ্রাণ, যার দ্বারা অঘ্রাণের অন্ধকারে সবুজ পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, চড়ুয়ের ডিম নীল হয়ে যাচ্ছে, দেহে প্রবেশ করছে বিকেল বেলার ধূসরতা, কুয়াশায় ঘনতায় ক্রমে একটা অপ্রাকৃত আবহ সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। অস্তিত্বের মূলে মৃত্যুর গূঢ় বার্তা এইভাবে পৌছে দিয়ে জীবনানন্দ আত্মমগ্ন গীতলতায় একদিকে ধরে রাখলেন জীবনে অনিঃশেষ অনুরণন, অন্যদিকে ধরা পড়লো নিরুত্তাপ বাসনার চোখ দিয়ে পউষ সন্ধ্যায় এক নারীকে দেখবার উদ্বেল অস্থিরতা।"[২]

১। বুদ্ধ দেব বসু 'কবিতা' পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

২। জহর সেন মজুমদার;জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য/মডেল পাবলিশিং হাউস;কলিকাতা - ৭৩/ প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৪০৫, পৃ. - ৩১৬

'ক্যাম্পে' কবিতায় জীবনানন্দ বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্য্যের অন্তরালে অকাল মৃত্যুর নির্মম চিত্র অঙ্কন করেছেন। বসন্তের প্রকৃতি যখন দক্ষিণা বাতাসে, জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল, তখনই চলছে হরিণ শিকারের নির্মম আয়োজন। হরিণীর ডাকে পুরুষ হরিণরা প্রেমের অভিসারে যাত্রা করে। বসন্তের জ্যোৎস্নায় ঘাইমৃগীর ডাকে বনের হরিণরা বিভ্রান্ত হয়েছে। প্রেমের উত্তেজনায় প্রেমিক হরিণরা ভুলে গেছে বাঘেদের মতো হিংস্রপ্রাণীদের অস্তিত্ব। 'উদভ্রান্ত হরিণদের মনে হয়েছে - কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন'[১]। শেষ পর্যন্ত হরিণ-হরিণীর মিলন হয় না, শিকারীর গুলিতে হরিণকে প্রাণ দিতে হয়। - এই মৃত্যুদেখে ঘাইমৃগীদের হয়তো বিস্ময় বা বেদনা হৃদয়ে জেগে ওঠে না। কবির বসন্তের রাতে প্রেমের এই ট্র্যাজেডিকে দেখে প্রশ্ন করেন ঃ "প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই, / পাই না কি?"[২] এখানে যেন বসন্তের জ্যোৎস্না ও মৃগীর ছলনায় হরিণের এপরিণাম হয়েছে। লালসা - আকাঙ্খা - সাধ - প্রেম - স্বপ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বসন্তের রাতে। সভ্যসমাজের হৃদয়হীনতায় "খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ।" কোনো এক বসন্তের রাতে শিকারীদের সঙ্গে তিনিও ক্যাম্পে বাস করেছেন। কবি সেই বসন্ত রাতের সৌন্দর্যতা ও নির্মমতাকে একই সঙ্গে প্রকাশ করেছেন এ কবিতায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'টোপ' গল্পে একই বিষয় আলোচনা করেছেন। সেখানেও প্রকৃতির সৌন্দর্যের পাশাপাশি মানুষের হিংস্র - লুব্ধ - হৃদয়হীন পাশবিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

আরেকটি কবিতায় বসন্ত রাতে কবিকে জেগে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়। এই রাত কবিকে আর একরকম স্বাদ দিয়েছে। এইরকম কবিতাটি হল 'পাখিরা'। এখানে কবি জানিয়েছেন ঃ

"আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।"[৩]

(পাখিরা / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

'পাখিরা' কবিতাটিতে রয়েছে জীবনবোধের গভীর স্বাদ। বসন্তের রাত, সমুদ্রের জলের বাতাস - শরীরী আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের সুস্থতা নিয়ে কবি সজাগ। শীতকে অতিক্রম করে পাখিরা পৌঁছেছে বসন্তের দেশে। তারা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে চলমান জীবনে উপনীত থেকেছে। যেখানে রয়েছে বংশ রক্ষার দায়বোধ। এখানে বসন্ত ঋতু জীবনের প্রতীক। যার মধ্যে রয়েছে অগাধ জীবনের স্বাদ।

" 'ক্যাম্পে' কবিতাটিতে যেমন দোনলার থেকে উৎসারিত মৃত্যুর মুখে এসে পড়ছে ঘাইহরিণীর ডাকে হারিণের দল, 'পাখিরা' কবিতাটিতে তেমনই ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে মেরুপাহাড়ের থেকে দলে দলে সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত মরণের মুখে এসে ঝরেছে প্রানোচ্ছল পাখিরা। ..... আসলে জীবন আর মৃত্যুর অন্বয়ের বার্তা তাদেরও 'বাদামি সোনালি সাদা, ফুটফুট ডানার, ভিতরে / রবারের বলের মতন ছোট বুকে' পৌঁচেছে। তাই অস্তিত্ব - রক্ষার সংগ্রামে নতুন প্রাণভূমির সন্ধানে ব্লিজার্ডের তাড়া - খাওয়া এই পাখিরা ছুটে আসছে মেরু পাহাড়ের শীত পিছনে ফেলে। ব্লিজার্ড আর শীত এখানে মৃত্যুর প্রতিভূ — "যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে / তেমন অতল সত্য হয়ে।"[৪]

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ৮৫
২। তদেব;পৃ. - ৮৫
৩। তদেব;পৃ. - ১১০
৪। প্রদ্যুম্ন মিত্র ;জীবনানন্দের চেতনাজগৎ-দে'জ পাবলিশিং কলকাতা - ৭৩ / দ্বিতীয় সংস্করণ;বৈশাখ, ১৪০৫, পৃ. - ১৫৭

'অনেক আকাশ' কবিতায় জীবনবোধ ও মৃত্যুবোধ - দুয়েরই স্পষ্ট আভাস রয়েছে কবিতায়। সৌন্দর্যের অবসান, নষ্ট পৃথিবীর কথা, মৃত্যুর জরাগ্রস্তরূপ, জীবনের ক্ষয় ও যন্ত্রনা - মৃত্যুবোধের ইঙ্গিত দেয়। জীবনানন্দ এই নেতিবাচক পরিস্থিতির পাশাপাশি জীবনবোধের ইতিবাচক দিকগুলিকে উল্লেখ করেছেন। 'অনেক আকাশ' একটি দীর্ঘ কবিতা। একবিতায় জীবনবোধ ও মৃত্যুবোধ দুইয়ের পাশাপাশি অবস্থান রয়েছে। শীত ঋতুও হেমন্ত ঋতু এই দুই ঋতুর কথা বলা হয়েছে। 'হেমন্তের নদী' এবং 'শীতের নদী' দুই নদীর প্রাণোচছ্বলতা দুই রকম। শীতের সময়ে নদীর গতিবেগ একেবারে ক্ষীণ হয়ে পড়ে। হেমন্তের সময়ে নদীতে যদিও বা কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষার আলোড়ন বইতে থাকে, শীতে সেই নদীর হৃদয়ের সমস্ত শক্তি শূন্য হয়ে যায়। তখন নদীর ক্ষুধিত রূপের প্রকাশ পায়। জীবন-মৃত্যুর মাঝে চোখ বুজে কবি একাকী দেখেছেন পৃথিবীর রূপ। পৃথিবীতে একদিকে সৌন্দর্য ও অন্যদিকে সৌন্দর্যের অবসান হতে দেখেছেন তিনি। ভোরের রোদের সঙ্গে আকাশের মেঘ, আলোর চুম্বনের সঙ্গে পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর, নক্ষত্রের সঙ্গে রাতের অন্ধকার — এসব কবি জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছেন। দুই বিপরীত চিত্র কবি একবিতায় অঙ্কন করেছেন। আশ্চর্যভাবে কবি জানিয়েছেন ঃ "জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার।"[১]

'দাঁড়ায়েছিলাম গিয়ে মাঘরাতে, — কিংবা ফাল্গুনে।' শীতঋতুবাচক মাঘমাস এবং বসন্ত ঋতুবাচক ফাল্গুন মাস এই দুই ঋতুর অনুষঙ্গ এসেছে 'পরস্পর' কবিতায়। কবি আবার কখনো বলেছেন ঃ "তারপর, — শীত-হেমন্তের শেষে বসন্তের দিন / আবার তো এসে যাবে।"[২] একটি রূপকথার কাহিনী দিয়ে একবিতার বিষয়বস্তু কবি রচনা করেছেন। কবি একদিকে দেখেছেন মৃত্যু, অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীর করুণ রূপ, উল্টো দিকে অবস্থান করেছে অগাধ, স্বচ্ছ জীবনের আকাঙ্খা। জীবনের আলোকে বসন্ত ঋতু ও মৃত্যুর জড়তার রূপকে শীত ও হেমন্ত ঋতুর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কবিতায়। এখানে একদিকে রয়েছে যন্ত্রনা ও অন্যদিকে রয়েছে রোমান্টিকতা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এর প্রভাব রয়েছে।

"ও কী সুরে গায় গান, হৃদয় আমরা?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই — অবিরাম অনিবার
ও কী সুরে গায় গান, হৃদয় আমার?"[৩]
(হৃদয়ের গীতধবনি / সন্ধ্যাসংগীত)

এর সঙ্গে তুলনীয় ঃ "আলো অন্ধকারে যাই — মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;"[৪] (বোধ / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতার মধ্যে কোন ঋতুর উপস্থিতি নেই ঠিকই। তবে, রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়ের গীতধবনি' কবিতার ভাবের সুর একবিতায় লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটিতে শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-শরৎ - এসব ঋতুর অনুপস্থিতি দৃশ্যতঃভাবে উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলেছে। জীবনানন্দের কবিতার স্বপ্ন-শান্তি-ভালোবাসা নায়কের জীবনে আজ অনুপস্থিত হলেও কোন একদিন উপস্থিত ছিল। তাই বস্তুত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-৬৭
২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী;কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১২৩
৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-৭৮

পল্লীপ্রকৃতির নানা ছবি 'অবসরের গান' কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। কার্তিকের ভোরে ক্ষেতের উপর রোদ পড়েছে। উপমা প্রিয় কবি জীবনানন্দ এ দৃশ্যকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

"শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে,"[১]

কবি ফলন্ত ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছেন গর্ভবতী ধান্যনারীর সৌন্দর্য্য। দেখেছেন রূপশালী ধানের মাতৃত্বের পরিণতি। হেমন্তের ধানকে গর্ভে ধারণ করে পৃথিবী যেন দুপা ছড়িয়ে বসে আছে। শারীরিক অবসাদ, ক্লান্তি ঘিরে ধরেছে হেমন্তের সময়ে। কার্তিকের মিঠেল রোদে পাড়াগাঁর অবসন্ন মানুষদের মধ্যে উৎসবের আহ্লাদ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। ফলন্ত ধানের রঙ, গন্ধ, স্বাদ - এ পরিপূর্ণ হয়েছে সকলের দেহ। মাটির বুক থেকে তোলা শীতল মদ ও আইবুড় নবীন যৌবনা পাড়াগাঁর মেয়েদের দৈহিক নৃত্য পরিবেশনে উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর কবি হেমন্তের দায়িত্বের অবসান ঘটিয়েছেন এভাবে ঃ

"হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালির বিছানার'পর
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ মাঠের মাটির ভিতর!
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চলে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড় মেয়েদের দল।"[২]

(অবসরের গান / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

'অবসরের গান' কবিতায় গ্রীষ্ম ঋতুর প্রসঙ্গও রয়েছে। গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে চোখে সমুদ্রের ঠাণ্ডা মধুর স্বর, ঘুমের ক্লান্তি এনে দেয়। তিনি উষ্ণতা ও শীতলতার সমন্বয়ে অগাধ জীবনের জয়গান ঘোষণা করেছেন। চিরনবীনতার গানও গেয়েছেন কবি ঃ

"আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে মাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা রোদ, — ভাঁড়ারের রস।"[৩]

৩৪টি স্তবকে বিন্যস্ত একটি দীর্ঘ কবিতা 'জীবন'। এ কবিতায় জন্ম, প্রেম ও মৃত্যুর আবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বুকে যেমন ছয়ঋতুর আবর্তন ঘটে, তেমনি মানুষের জীবনচক্রে ঘটে জন্ম-মৃত্যু ও প্রেমের আবর্তন। কবি দেখেছেন সবুজ সতেজ জীবনকে মৃত্যুরূপী শীতের স্পর্শ নষ্ট করে দেয়।

"যে পাতা সবুজ ছিল — তবুও হলুদ হতে হয়, —
শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে;"[৪] — (জীবন / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

জীবনানন্দের কাব্যে শীত ঋতু বেশিরভাগ সময়ে মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। শীতে গাছের পাতা ক্রমশ অসাড় হয়ে যায়। রক্তের মধ্যে বরফের মতো শীত মৃত্যুর হিম অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। শীত শরীরের ভেতরে অবস্থিত অস্থিকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। শীতেই সবুজ সতেজ পাতা হলুদে পরিণত হয় অথবা মৃত্যুশায়ী ঝরাপাতার রূপ নেয়। মানব শরীরে রক্তের মধ্যে বরফের মতো শীত মৃত্যুর হিম অনুভূতিকে শুধু জাগিয়ে তোলে না, সমস্ত ফসলের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে দেয়। শীতের হিমার্ততার মধ্যে গাছের পাতার মতো মানব জীবনকেও ঝরে পড়তে দেখেছেন কবি। এই জন্যেই কবি বলেছেন ঃ

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ৮১
২। তদেব;পৃ. - ৮১
৩। তদেব;পৃ. - ৮১
৪। তদেব;পৃ. - ৮৮

"শীত রাত ঢের দূরে, — অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে!
শাদা হাত দুটো শাদা হাড় হয়ে মৃত্যুর খবর
একবার মনে আনে।"[১] (জীবন / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

কবি জীবনানন্দ বিভিন্ন ঋতুর প্রেক্ষাপটে জীবন ও মৃত্যুর বোধকে আলাদা আলাদা করে অনুভব করেছেন। ফসলের জন্ম ও মৃত্যু অনেকখানি ঋতু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। নারীর প্রেম বড়োই রহস্যময়। এ প্রেম অতি তুচ্ছ কারণেই হারিয়ে যায়। প্রেমহীন জীবন মৃত্যুর মতোই বেদনাদায়ক। ব্যর্থ প্রেমিক সারাজীবন ধরে খুঁজে বেড়ান প্রিয়াকে। 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় পৃথিবী-আকাশ-ঘাস-তারা-এসবের মধ্যে প্রেমিকা জীবনের স্বাদ নিয়ে জেগে থাকে। অথচ কবির বুকে আছড়ে পড়েছে মৃত নক্ষত্রের শীত। কখনো কখনো একের উষ্ণতা অন্যের কাছে শীতের হিমার্ত অনুভূতি হয়ে ধরা দেয়। 'অনেক আকাশ' কবিতায় জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখেছেন জীবনের এপার থেকে মৃত্যুর ওপারকে ঃ "জীবন-মৃত্যুর মাঝে চোখ বুজে একাকী দাঁড়ায়ে;"[২]। 'প্রেম' কবিতায় তিনি দেখেছেন চলমান জীবনের পরিবর্তন। প্রবহমান জীবনে জন্ম, মৃত্যু ও প্রেম সহজাত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বেশিরভাগ কবিতায় মৃত্যুচেতনা রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন শুধু মানুষের নয়, নক্ষত্র - আগুন - ধানক্ষেত - শিশির - গাছ-ফুল-ফসল-এমনকি পৃথিবী, সবকিছুরই মৃত্যু হবে। কবি রোমান্টিক মন- নিয়ে অনুভব করেছেন মৃত্যুকে। এই মৃত্যুকে শীত, হেমন্ত ঋতুর পাত্রে ঢেলে কবিতায় তিনি সাজিয়েছেন। 'প্রেম' কবিতায় মৃত্যুকে দেখেছেন এভাবে ঃ- "অসাড় হতেছে পাতা শীতে, / হৃদয়ে কুয়াশা আসে, — জীবন যেতেছে তাই ঝরে।"[৩] এ কবিতায় মৃত্যুর মতো প্রেমকে জীবনের অনিবার্য পরিণতি বলে মেনে নিয়েছেন। জীবনের অধীর আঘাতে প্রেম চলে যেতেপারে। প্রেমের শক্তি দুর্নিবার। সূর্যের চেয়ে, নক্ষত্রের চেয়ে প্রেমের প্রতি স্বনির্ভরতা অনেক বেশি শক্তিশালী। প্রেমের কাছে মৃত্যুর ভয়াবহতাও তুচ্ছ হয়ে যায়। — 'অঘ্রাণের রাতে' কিংবা 'কার্তিকের শীতে' কবি বলেছেন —

"একদিন — একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
একরাত — একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।"[৪] (প্রেম/ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রেম রহস্যময়। সহজে প্রেমকে ধরা যায় না। কবি বলেন, "আমরা ধরেছি ছায়া, — প্রেমেরে তো পারিনি ধরিতে!"[৫] এই প্রেম অতিতুচ্ছ কারণেই ছিন্ন হয়ে যায়, হারিয়ে যায়। এই প্রেমের খোঁজেই বিভিন্ন ঋতুকাল ধরে প্রেমিকেরা অভিসার করে।

"প্রথম প্রণয়ী সেথে, কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে যেতে
থেমে গেছে সে আমার তরে!"[৬]

কার্তিকের ভোরে প্রণয়ী তার হৃদয়ে পিপাসা নিয়ে প্রেমাভিসারে যাত্রা করেছে। এই প্রেম নারী - পুরুষ অর্থাৎ রক্ত আর মাংসের স্পর্শ সুখভরা দেহের স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়। পৃথিবীর ক্ষেতে সবুজ ফসলের উপর যেমন কৃষকের ক্ষুদ্‌পিপাসার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তেমনি পিপাসাতুর হৃদয়ে কবি প্রেমকে ফসলের গানে খোঁজেন। চাষার মতো কবি বলেন ঃ

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ৮৮
২। তদেব;পৃ. - ৭১
৩। তদেব;পৃ. - ১০২
৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১০২
৫। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১০২
৬। তদেব;পৃ. - ১০২

"হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখপাখানীর পালে
উঠানের;— পেতে থাকে কান, —
শোনে ঝরা শিশিরের গান
অঘ্রাণের মাঝরাতে
হিম হাওয়া মেন শাদা কঙ্কালের হাতে
এদেহেরে এসে ধরে, —
ব্যথা দেয়!"[১] (পিপাসার গান / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

কবি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় ঋতুর বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গীকে ইন্দ্রিয় উপভোগ্য বিষয় করে গড়ে তুলেছেন। ঋতুর আবেশ জড়ানো মৃত্যু ও জীবনের নানা অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মৃত্যুরূপী ঝরা হেমন্ত ও শীতের অসারতা তাঁর কবিতায় বারে বারে উপস্থিত হয়েছে। জীবনকে ভালোবেসে কবি হেমন্ত ও শীতের শেষে বসন্তের দিনের জন্য অপেক্ষা করেছেন। বাংলার প্রকৃতি, লোকজীবনের পুরাণকথা, রূপকথা, গল্পকথা মূলতঃ এক হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীকে উন্মোচন করেছেন 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুচ্ছতে। জীবনানন্দ তাঁর অতীতের ছবিকে মিশিয়ে দিয়েছেন বর্তমানের আবহমানে। বরিশাল জীবনানন্দের দেশ। কবির চেতনায় এসেছে বাংলার লৌকিক জগৎ - চাঁদ, বেহুলা, রামপ্রসাদের শ্যামার সুর। প্রিয় মাতৃভূমিকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা'[২] বা 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'[৩]র মতো জীবনানন্দ ও সগর্বে বলেছেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ / খুঁজিতে যাই না আর'[৪]। 'রূপসীবাংলা'র কবিতাগুচ্ছগুলি সনেটের রূপবন্ধে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচে ঝলসানো বাংলা র গ্রামের রূপ দেখে ব্যথিত কবি জীবনানন্দ প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নাগরিক জীবনের কোনরকম জটিলতা ছাড়াই বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষকে ছুঁতে চেয়েছেন এই কবিতাগুলিতে। তিনি একটি বিশেষ ভাবাবেগে চালিত হয়ে দু-তিন দিনের ভিতরে লিখে ফেলেছিলেন 'রূপসীবাংলা'র সনেট জাতীয় কবিতাগুলি। এ কাব্যের সময়কালের ইতিহাস ছিল রক্তমাখা। তাই 'রূপসীবাংলা'র কবিতাগুচ্ছ গুলিতে সহজিয়া আনন্দের সঙ্গে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ ও ঘটেছে। তাই কবির লেখায় চোখে পড়ে বিষণ্ণ যন্ত্রনার ছবি ঃ

"—কালো মেঘ জমিয়েছে মাঘের আকাশে,
মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিপঁড়ারা চলে যায়;"[৫] (ভিজে হয়ে আসে মেঘে / রূপসীবাংলা)

'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে বাংলার যে রূপটি পরিস্ফুট তা খুবই আকর্ষণীয়। জীবনানন্দের 'রূপসীবাংলা'র গ্রামীন পটভূমি বারবার বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

"রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১০৬
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গীতবিতান / বিশ্ব সাহিত্য ভবন ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা ১৯৭
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গীতবিতান / বিশ্ব সাহিত্য ভবন ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা ২০৫
৪। তদেব;পৃ. - ১২০
৫। তদেব;পৃ. - ১৩০

শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্যরাত্রে বেণুর শীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায়, ডালে - পাতায় চিকচিক করে। আলো-আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্যভরা।"[১]

জীবনানন্দ লিখেছেন —

"গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
উড়ে যায় — মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে;
পুকুরের লাল সরক্ষীণ ঢেউয়ে বারবার চায় যে জড়াতে
করবীর কচি ডাল;চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটির পায়
- -
শাদা পথ — সোঁদাপথ — বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চলে গেছে — শ্মশানের পারে বুঝি
— সন্ধ্যা আসে সহসা কখন;
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম—নিম—নিম কার্তিকের চাঁদে।"[২]
(গোলপাতা ছাউনির / রূপসীবাংলা)

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গ জগৎ অপরূপ। নিসর্গ জগতে দাঁড়িয়ে প্রেমিক অনুভব করেছে প্রেমের অবিনশ্বরতাকে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কবিতাগুচ্ছের নিসর্গ ভুবনে ঝরে পড়েছে হলুদপাতা। এ কাব্যের হেমন্ত ঋতু শিশির - কুয়াশাভরা - ধূসরময়। 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশপদীগুচ্ছের নিসর্গের রূপ ঝরেছে অন্যরকম ঃ "সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে"[৩] (সেই দিন এই মাঠ) - এমনই স্বপ্নের অনুভূতিতে। রূপশালী ধান, রূপসী নারী, পৃথিবীর রূপ — এসব প্রসঙ্গের মধ্যে কবির জীবনের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। কবি রূপসী বাংলার প্রতি গভীর ভালোবাসা, মৃত্যুর অনিবার্য বেদনাদায়ক অবস্থাকে মিলনের মধুর মুহূর্তের উদাহরণে পরিণত করেছেন। তাই কবি বলতে পেরেছেন ঃ

"রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে, তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।"[৪]

জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলি বর্ণময় ও দৃশ্যরূপময়। কবি কীটসের মতো ইন্দ্রিয় সচেতন কবি জীবনানন্দ। 'রূপসী বাংলা'র অজস্র কবিতায় স্পর্শ-গন্ধ-রঙে ভরা রমণীয় ছবি রয়েছে। রয়েছে অতীত স্মৃতিচারণের নানা গল্পকথা। আর রয়েছে সমকালীন রক্তক্ষরা সংগ্রামের ছাপ। তবুও কবির ইচ্ছা 'পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে'[৫] ঘাসে ভরা বাংলায় কবি হয়ে থেকে যাবেন। আশ্বিন মাসের ভোরে শারদ আকাশে রূপমুগ্ধ কবি প্রত্যাশা করেছেন বক ও মাছরাঙা পাখির ডানা সঞ্চালনের দৃশ্য। কবি রামপ্রসাদী সুরে শ্যামাসঙ্গীতের মাধুর্যকে প্রাণভরে আস্বাদ করতে চেয়েছেন। শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা, মাণিকমালার মতো রূপকথার জগতের সুন্দরী রূপসী নারীর হাতের কাঁকনের অনুরণনকে কবি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। অতীতে যেসব রূপসী রমণীরা শব, চন্দন চিতায় জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তাদের

১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, ১৯৭০, পৃ. - ৬৭
২। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১২৯
৩। তদেব;পৃ. - ১১৯
৪। তদেব;পৃ. - ১১৯
৫। তদেব;পৃ. - ১২০

গৌরবময় স্মৃতিকে কবি কোন এক আশ্বিনের ভোরে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

ধানসিড়ি, জলসিড়ি নদীর কথা বিশালাক্ষী মন্দিরের কথা জীবনানন্দের কবিতায় রয়েছে। বিশালাক্ষী মন্দিরের কপাট ধূসর বর্ণের। পুরোনো দিনের এই বিশালাক্ষী মন্দির, ভাঙা ঘাট - অতীতের এই স্মৃতি কবির মনে জেগে উঠেছে। রূপসীরা আজ সে ঘাটে আর আসেনা। কলমীদাম এই অব্যবহৃত ঘাটে বাসা বেঁধেছে। সে জলাশয়ে আজ পাটকে পচানো হয়। সেই রূপসীদের চিতা আমকাঠে সাজানো হয়েছিল, তাদের সমাধিস্থল এখন আকন্দ, বাসকলতায়। বাংলার ধানীশাড়ি, শাদা শাঁখা পরা রমণীরা পার্থিব জগৎ থেকে এখন বহু দূরে অবস্থান করছে। বাংলার মাঠে বটের নীচে তারা চিরঘুমে নিদ্রিত আছে। কবির আকাঙ্খা "পশমের মত লাল ফল / ঝরিবে বিজন ঘাসে' আর

"বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ চেয়ে রবে;"[১]। (একদিন জলসিড়ি নদীটির)

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভরা পৃথিবীর রূপে মুগ্ধ কবিপ্রাণ। কবি পেয়েছেন নরম ধানের গন্ধ, কলমীর গন্ধ, পুকুরের চাঁদা, সরপুঁটি মাছের গন্ধ। বিরহী প্রেমিক কবি মন বাংলার কিশোরীদের ভিজে ঠাণ্ডা হাতের নরম স্পর্শ পাওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন। গৃহকাজে নিপুণা কোন এক 'কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত — শীত হাতখান'[২] কবির হৃদয়ে আন্তরিক অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। বাংলার শান্ত সন্ধ্যায় চির সত্যের আলোক দিশারী আকাশে সাতটি তারা যখন ফুটে উঠেছে তখনই কবির চোখের উপরে, মুখের উপরে এসব ছবি ভেসে উঠেছে।

বর্ষার পটভূমিতে কবি লিখেছেন কালীদহের বিপন্ন পৌরাণিক কথা। কবি শুনেছেন আষাঢ়ের দ্বিপ্রহরে কালীদহের ঝোড়ো বাতাস ও বিপন্ন যাত্রীর আর্ত কলরব। চাঁদসদাগর, মধুকর ডিঙা, আলুলায়িত চুলে সনকার — পৌরাণিক এসব অতীত কাহিনীকে কবি জীবনানন্দ লিপিবদ্ধ করেছেন। ধলেশ্বরী চড়ায় কবি দেখেছেন গাংশালিকের ঝাঁক ভেসে বেড়াচ্ছে। তা দেখে কবির মনে হয়েছে 'এইসব পাখিগুলো কিছুতেই আজকের নয় যেন', 'এনদীও ধলেশ্বরী নয়', 'ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে', 'এনদী কালীদহই।'[৩]

'রূপসীবাংলা'র একাধিক কবিতায় কবি লোককথা, পুরাণ কথাকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার সাথে সাথে গ্রথিত করেছেন। পল্লীবাংলার বুকে কীর্তন, ভাসানগান, রূপকথা, যাত্রা, পাঁচালী - এই লোক উৎসবগুলির আনন্দমুখর প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে এসেছে। কবিও বাংলায় অভ্যস্ত জীবনে তৃপ্তি পেয়েছেন এই আনন্দগুলিকে গ্রহণ করে। বেহুলা-লহনার মতো সতীসাধবী নারীদের কবি দেখেছেন গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে। লোকজীবনের বেদনাদায়ক জীবনপ্রণালী দেখে কবির মন বিচলিত হয়েছে। তাই কবি ভাবেন, 'নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়।'[৪]

কবি বার বার বাংলার কোমল মনের কিশোরীদের স্পর্শ আকঙ্ক্ষা করেছেন। কখনো কবি দেখেছেন, ' এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল'[৫]। কিশোরীর স্পর্শে করবীফুল ছিন্ন হওয়া, তার শাদা আঠা দুধের মতো ঘাসের উপরে ব্যাকুলভাবে ঝরে পড়ছে। কতটা একাত্ম হয়ে পর্যবেক্ষণ না করলে এমন অনন্য সাধারণ বক্তব্য উঠে আসতে পারে। দর্শনীয় লাইনটি এরকম ঃ

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১২১
২। তদেব;পৃ. - ১২২
৩। তদেব;পৃ. - ১২৩
৪। তদেব;পৃ. - ১২৩
৫। তদেব;পৃ. - ১২৩

" — শাদা স্তন ঝরে
করবীর কোন এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে নরম ব্যাকুল।"[১] (জীবন অথবা মৃত্যু)

যখন গৌড় বাংলায় হেমন্তের আগমন হয়, তখন কবির চোখে নিসর্গ প্রকৃতি একটু বিষণ্ণ রূপ ধারণ করেছে। কবি জীবনানন্দ তাই অতি সহজেই মৃত্যুচেতনাকে হেমন্ত ঋতুর প্রেক্ষিতে প্রকাশ করতে পেরেছেন কারণ মৃত্যুতো বিষণ্ণতাপূর্ণ। কার্তিকের অপরাহ্নে হিজল পাতা উঠানে ঝরে পড়ে। এযেন হেমন্ত ঋতুর মুখচ্ছবির আড়ালে ভেসে উঠেছে কবি জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনার স্পষ্ট ইঙ্গিত। কঙ্কাবতী, শঙ্খমালা - এসব রূপকথার রূপসীদের দেহের গন্ধ ম্লান হয়ে গেছে। এদের দেহের উপর জন্ম নিয়েছে অসংখ্য ঘাস। যে ঘাসের ভিতরে শুয়ে আছে সোঁদা ধুলো, আর উপরে এই সবুজ ঘাসের উপরে নরম হলুদ পায়ে নেচে বেড়ায় বাংলার পরিচিত পাখি শালিখ। নিসর্গ প্রকৃতি এই বিষণ্ণ রূপ আরও স্পষ্ট হয়েছে কবির এ ধরণের লেখাতে ঃ

"যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়
কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়।
ঝরে পড়ে,"[২] (জীবন অথবা মৃত্যু)

কবির কাছে অতীত মানেই ধূসরময়। কবি মৃত্যুকে অনিবার্য নিয়তি মেনে নিয়েই বলেছেন ঃ "ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে / শিয়রে বৈশাখ মেঘ - "[৩]। আম-জাম কাঁঠালে ঘেরা বাংলা দেশের পল্লীগুলি অপরূপ। শ্যামা, খঞ্জনা এসব নাচুনে গাইয়ে পাখিগুলির মতোই কবি পল্লীর বুকে ঘর বেঁধেছেন। এই পাখিদের মতোই তিনি নড়বড়ে আশ্রয়স্থলকে ঘিরে কত স্বপ্ন দেখেছেন। ধান কাটার পর মাঠে মাঠে ঘুরে কবি কতবার খড় কুঁড়িয়েছেন।

"আবার আসিব ফিরে' কবিতায় জীবনানন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বাংলায় কোন এক কার্তিকের নবান্নে ভোরের কাক হয়ে জন্মগ্রহণ করতে। বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত সবই কবির ভালোলাগার, প্রিয় বিষয়। 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলোতে কিশোরের প্রতিচ্ছবি কবির চোখে বারবার ভেসে উঠেছে। রূপসার ঘোলা কর্দমাক্ত জলে কিশোর শাদা ছেঁড়া পাল নিয়ে ডিঙি বেয়ে চলাচল করেছে। রাঙা মেঘ সাঁতার দিয়ে অন্ধকার পেরিয়ে নীড় প্রত্যাশী ধবল রঙের বক আকাশপথে উড়ে চলেছে। অবোধ শিশু খইয়ের ধান আপন মনে উঠোনের উপর ছড়িয়ে ফেলছে। লক্ষ্মীপেঁচা শিমুলের ডালে ডাক দিচ্ছে। সন্ধ্যার বাতাসের সঙ্গে সুদর্শন পাখি উড়ে চলেছে। — বাংলার এসব দৃশ্যের ভিড়ে কবি বলছেন; 'আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে —"[৪]। (আবার আসিব ফিরে) কবি বলেছেন মানুষ না হলেও শঙ্খচিল, শালিখ, কাক, হাঁস — যাই হোক না কেন, তিনি ফিরবেন আবারও এই বাংলায়, এই ধানসিঁড়ির তীরে।

"যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়
যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে ম্লান চোখ বুজে,"[৫] (যদি আমি ঝ'রে যাই)

কার্তিকের নীলরঙের কুয়াশা — এমনটা বলেছেন কারণ মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী নীল রঙ। এ কবিতায় তিনি

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১২৩
২। তদেব;পৃ. - ১২৩
৩। তদেব;পৃ. - ১২৫
৪। তদেব;পৃ. - ১২৬
৫। তদেব;পৃ. - ১২৬

আবারও বলেছেন, "একদিন ছেড়ে যাবে আম জাম বনে নীল বাংলার তীর" রোমান্টিক কবি মন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শকে নিরন্তর গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এমনকি তিনি কিশোরীর স্পর্শ পাওয়ার আর্তি থেকে মৃত্যুকে আহবান করেছেন।

"কবে যে আসিবে মৃত্যু ঃ বাসমতী চালে — ভেজা শাদা হাতখান —
রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরোচণারূপে আমি কবির যে স্নান —"[১]

যে মৃত্যুর আহবান শুনেও চিল, শালিখেরা রৌদ্রের ভেতর দিয়ে উড়ে চলে। মৃত্যুতে দানাশস্য যেমন মৌরি, ধান আপনা হতে ক্ষেতের উপর ঝরে পড়ে। কবিও তেমনি ভেবেছেন কোনো এক কার্তিকের কুয়াশার মধ্যে পার্থিব জগৎ ছেড়ে চলে যেতে পারেন। তিনি মৃত্যুর নীল ভয়ানক রূপ দেখেছেন হিমের ভেতর কুয়াশায় ঝরে পড়া রূপশালী ধান, নক্ষত্রের খসে পড়া, পেঁচার কাছে ইঁদুরের মরণ, — এসব মরণান্তিক দৃশ্য দেখে কবির উপলব্ধি, বাংলার বুক ছেড়ে কবিকেও একদিন চলে যেতে হবে। মৃত্যুর ডাক শুনেছেন কবি, যেমন করে 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে তারাশঙ্কর তাঁর মৃত্যু দেবীর ডাক শুনিয়েছেন পাঠকদের।

'রূপসী বাংলা'তে কবি রক্তঝরা মৃত্যুর ইঙ্গিত প্রায় প্রতিটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কবি দেখেছেন সবুজ সতেজ পাতা মৃত্যুকালে হলুদ বাদামী ঝরা পাতার রূপ পরিগ্রহণ করে। নীড় প্রত্যাশী কাকের মতো কবিও এজন্ম শেষ করে সারাজীবনের শেষে আসন্ন সন্ধ্যার মতো জীবনের এপারে মৃত্যুতীরে উপস্থিত হওয়ার কথা বার বার ভেবেছেন। 'শরতের রোদের বিলাস' নয় 'ঘাসের বুকে রবো মুখ গুঁজি'[২] — মৃত্যুকালে এমনই আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন।

'গোলপাতা ছাউনির' কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ গ্রাম-বাংলার এক পরিচিত দৃশ্যকে অঙ্কন করেছেন। তিনি দেখেছেন, কার্তিকের কুয়াশার সাথে আমবনকে মিশে যেতে। কুয়াশা পেরিয়ে আমবনকে কিছুতেই দেখা যায়না। পুকুরের উপর লালসা করবীর ঝুঁকে থাকা ডালকে ক্ষীণ ঢেউ বারবার জড়িয়ে ধরে। পুকুরের ধারে থাকা পোড়াবাড়িটির এক একটি ইট ধবসে জলে পড়েছে। পল্লী নারী চাল ধোয়া ভিজে হাতে চুলের বিনুনি খসাচ্ছে - এমন নানা অপূর্ব দৃশ্য কবি এঁকেছেন 'রূপসী বাংলার' কবিতায়। পরের ছয়টি লাইনে কবি পল্লীর এই রমণীয় দৃশ্যকে বিষণ্ন রূপ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। কার্তিক মাসের বিষণ্ন বিধূর রূপটি এমনই :

"ডাইনীর মতো হাত তুলে তুলে ভাঁট আশ শ্যাওড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝি নাকো, - বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে,
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি, হায়, এমন বিজন
শাদা পথ — সোঁদা পথ — বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চলে গেছে — শ্মশানের পারে বুঝি; — সন্ধ্যা আসে সহসা কখন;
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম — নিম — নিম কার্তিকের চাঁদে।" [৩]
(গোলপাতা ছাউনির / রূপসী বাংলা)

কবি জীবনানন্দ তাঁর নানা কবিতায় মেঘের অপূর্ব রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। 'হায়চিল' কবিতার লাইন 'ভিজে মেঘের দুপুরে' সম্পর্কে এক তথ্যনিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন বীতশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন —

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১২৭
২। তদেব;পৃ. - ১২৮
৩। তদেব;পৃ. - ১২৯

"এই ভিজে মেঘের দুপুরে'র ধ্বনিসাম্যে মনে আসে এই মাঘের দুপুর। বর্ষার চিলপাখি ফিরে এসেছে শীতের দুপুরে, বসন্তের কোকিল জীবনানন্দের কবিতায় ফিরে এসেছে শীতের রাত্রে। 'হায়চিল' কবিতায় যে বাঙালির বর্ষা ঋতুর বাতাবরণ নেই তা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে 'রূপসী বাংলা' বইয়ের ২৪ সংখ্যক চতুর্দশপদীতে। 'হায়চিল' এর সাতটি পঙ্‌ক্তি যেন শিথিল বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে ঐ সনেটের রূপবন্ধে। 'হায়চিল, সোনালি ডানার, এই ভিজে মেঘের দুপুরে' এই ধুয়োপঙ্‌ক্তি দুটি প্রায় - অবিকল হয়ে ফিরে এসেছে এই চতুর্দশপদীর শুরুতে আর শেষে ঃ ভিজে হয়ে আসে এ দুপুর - চিল একা নদীটির পাশে, হে চিল, সোনালী চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবেনা কি প্রাণ? এ দুপুর যে বর্ষার দুপুর নয় তারও সাক্ষ্য আছে এ কবিতায় ঃ —কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে" [১]

মাঘ মাসের আকাশে কালো মেঘ জমেছে। ভিজে মেঘের দুপুরে নদীর পাশে এক জামরুল গাছের ডালে বসে বসে চিল, নদীর ওপারের দিকে চেয়ে থেকেছে। পায়রা উড়ে চলে গেছে। শসালতা ছেড়ে মৌমাছি তার বাসায় ফিরে গেছে। বউকথাকও পখিটির মুখে আর কোনো ডাক নেই। আমগাছে শালিখে শালিখে লেগেছে ঝুটোপুটি ঝগড়া। সবচেয়ে জীবন্ত একটি চিত্রকল্প, "মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে / পিপঁড়েরা চলে যায়;—"[২]। কবি জীবনানন্দ দেখেছেন গৃহের মঙ্গলকামী সেই গৃহবধূর অনুপস্থিতি। মাঘের আকাশে কালো মেঘ জমার মতো কবির প্রাণেও এই গৃহবধূর জন্য হঠাৎ মন করুণ হয়ে উঠেছে। আনমনা চিলকে দেখে কবির মনও ব্যাকুল ব্যথিত হয়ে উঠেছে। —

"..... বউও উঠানে নাই — পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি
ধান কে কুটিবে বলো — কত দিন সে তো আর কোটে নাকো ধান
রোদেও শুকাতে সে যে আসে নাকো চুল তার — করে নাকো স্নান
এ - পুকুরে - ভাঁড়ারে ধানের বীজ ফলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো ঃ আজ এ- দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি?
হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে নাকি প্রাণ?"[৩]

(ভিজে হয়ে আসে মেঘে)

সমকালীন যুদ্ধ বিধবস্ত পরিস্থিতি 'রূপসী বাংলা'র রূপকে কালিমা লিপ্ত করেছে। যুগ জ্বরাক্রান্ত পৃথিবীতে যেন কোথাও সুন্দরের জায়গা নেই। এমনকি কবির কাছে তাঁর প্রিয়া নেই বলে কবিও বিষাদ গ্রস্ত। আসলে সান্ত্বনা পাওয়ার স্থলতো প্রিয়া কিংবা প্রকৃতি কিন্তু আজ প্রিয়া অনুপস্থিত এবং প্রকৃতির মধ্যে যেন কোথাও রমণীয়তা নেই। তাই কবির আক্ষেপ করেছেন। পৃথিবীতে কখন সোনার রোদ নিভে গেছে। শুপুরির সারি অন্ধকারে ডুবে গেছে। প্রান্তরের ওপার থেকে গরম বাতাস উঠে আসছে। ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের অন্ধকারে কার যেন শ্বাসের আওয়াজ সশব্দে পড়ছে। কোন এক চৈত্রে কবির প্রাণ প্রিয়া পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই পৃথিবীর আকাশ, নক্ষত্র কোথাও কবির হারানো প্রিয়ার কোন চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না। তবে কবি তাঁর প্রিয়ার শরীরের গন্ধকে খুঁজে পান আজও। বাংলার মাঠে, ঘাসে, ঢেঁকিশাক — এগুলোর মাঝে কবি পেয়েছেন প্রিয়ার শরীরী গন্ধকে। তার প্রিয়ার রূপকে ছড়িয়ে পড়তে দেখেছেন সর্ষে ক্ষেতের অতুলনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে, ধান্যশীষের মধ্যে। কবি তাই অঘ্রাণে যে ধান ঝরে পড়ে, তারই দু-একগুচ্ছ কবি হাতে তুলে নেন। ধানের স্পর্শে কবি অনুভব করেন তাঁর প্রিয়ার উপস্থিতি। নিঃসঙ্গ কবি অকপটেই বলতে পারেন, "জানি সে আমার কাছে আছে আজো — আজো সে আমার কাছে আছে।"[৪]

১। বীতশোক ভট্টাচার্য;জীবনানন্দ/ বাণীশিল্প;কলকাতা-৯/ প্রথম প্রকাশ, ২০০১/ পৃ. - ১৩৩
২। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৩০
৩। তদেব;পৃ. - ১৩০
৪। তদেব;পৃ. - ১৩২

কবি একাধিকবার 'রূপসী বাংলা'র বিভিন্ন কবিতায় বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। পৃথিবীর কোন স্থানই তাঁর ভালোলাগার নয়। বাংলার রূপমুগ্ধ কবি মালাবার কিংবা উটির পর্বত কিংবা বিদেশের অভিযানে যাওয়ার ইচ্ছা কখনো প্রকাশ করেননি। বরং বাংলার নির্জন অঘ্রাণে, প্রান্তরের পথে পথে ছড়িয়ে থাকা পল্লীর মনোমোহিনী রূপের সৌন্দর্য পান করতে চেয়েছেন। বটের শুকনো পাতা কবির মনে যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে। মাটি আর কাঁকরের উপর অবিরল ঘাস, কবির ঘাস হয়ে জন্মানোর আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলে। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের বলাইর মনের ভাবনাটির মনে পড়ে —

> "ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না, ওর বোধ হয়, যেন ওই ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে - চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে।"[১]

বাংলার পথই কবির জীবনের চলার একমাত্র পথ। কবি বলেছেন, 'এইপথ ছেড়ে দিয়ে এ-জীবন কোনখানে গেল নাকো তাই'[২]। (এই ডাঙা ছেড়ে হায়)

'এখানে আকাশ নীল', 'এখানে ঘুঘুর ডাকে', 'শ্মশানের দেশে তুমি' — এই তিনটি কবিতায় কবি আশ্বিনের লাবণ্যময়ী প্রকৃতির কোলে জন্ম জন্ম ধরে আশ্রয় পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছেন। বাংলার প্রকৃতি আশ্বিনের মৃদু আলোর স্পর্শে সম্পূর্ণ অন্যরকম রূপ ধারণ করে। এখানে কোন কাঠিন্য, কোন ধূসরতা, কোন কালিমার বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। আশ্বিনের নীল আকাশে ফুটে উঠেছে হিম শাদা রঙের সজিনা ফুল। এই সময়ে বাংলার ঘুঘুর মধ্যে কোথাও কোন জটিলতার ফাঁদ পাতা থাকে না বরং এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে। মৌরীর গন্ধমাখা বাতাসে, অবিরল ঘাসে ঢাকা মাটিতে নিশ্চিন্ত মনে ক্লান্ত দেহকে রেখে দেওয়ার কথা ভেবেছেন। নরম হলুদ পায়ে খয়েরি রঙা শালিখগুলো 'ঘাস থেকে ঘাসে' ছড়িয়ে থাকা ধান কুড়িয়ে খায়। এ যেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই "সকল দেশের সেরা'র বাংলাদেশ। এমন দেশেই রূপমুগ্ধ কবিরা বারে বারে ফিরে আসেন।

> "দুববার কয়েকটা ছোপ
> ধানের গুচ্ছের একটু ছটা
> কয়েকটা দোয়েল ফিঙে টুনটুনি
> নরম হাসির আভা
> দু-একজনের ঠোঁট আদর করার মতো খোলা
> এইসব নিশানা ধরেই
> এখানে ফিরেছি আমি।"[৩]

পদ্মা, মেঘনা, ইচ্ছামতী শুধু নয় সাত সমুদ্র পেরিয়ে খুঁজে পাওয়া রূপকথার মতো দেশ এই 'রূপসীবাংলা'। এ দেশের মাটির বুকে অনন্ত সবুজ শালি ধানের স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ে। রাখি পূর্ণিমার রাতে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা-চাঁপা গাছে, কদম গাছে আশ্বিনের জ্যোৎস্নায় গান গায়। গাঙচিল কালীদহে, জীর্ণ বটে বাসা বাঁধে। 'রূপসী বাংলা'র কবি তাই বলেছেন ঃ

> "মৌরির গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিরে রেখে
> আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে
> র'ব আমি;"[৪] (এখানে ঘুঘুর ডাকে / রূপসী বাংলা)

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী;কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২৩২

২। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৩৩

৩। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সম্পাদিত - পাঠ সংকলন/কলকাতা - ১৬ প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৫/ পৃ. - ৪১

৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৩৫

জন্ম রোমান্টিক কবি জীবনানন্দ দাশ, যুদ্ধের ভয়ংকর পটভূমিতে অবস্থান করেও, কবির মন বারবার রূপকথার কল্পজগতে বিচরণ করেছে। পউষের ভিজে ভোরে কবির মন উড়ে চলেছে মাটির জগৎ থেকে রূপকথার জগতে। তিনি তাঁর মনকে সোনার খাঁচায় শিকল দিয়ে আটকে রাখতে চাননি কোন দিন। এ সম্পর্কে কবি যেন পাঠকদের গল্প শুনিয়েছেন ঃ

" ..... উড়ে চলো, —
যেখানে গভীর ভোরে নোনাফল পাকিয়াছে, — আছে আতাবন;
পউষের ভিজে ভোরে, আজ হায় মন যেন করিছে কেমন; —
চন্দ্রমালা, রাজকন্যা, মুখ তুলে চেয়ে দেখ — শুধাই শুনলো"[১] (সোনার খাঁচার বুকে)

'কত দিন সন্ধ্যায়' সনেটটি একটি প্রেম বিষয় কবিতা। কবি এখানে কার্তিক মাসের আকাশ প্রদীপের আলোয় প্রেমের মিলনের মধুরতা নির্মাণ করেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠ থেকে ভেসে এসেছিল গাজন গানের ম্লান ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস, আর মৌরীর গন্ধমাখা সুরভিত বাতাস যা সন্ধ্যাকালীন পরিবেশকে মাতাল করে তুলেছিল। আধফোটা জ্যোৎস্নার হলুদ শাড়িপরা কবির প্রিয়া যেন কবির কাছে সে সময়ে এসে বসেছিল। গভীর আঁধার তখন শটিবনে মিশেছে, মাঠ ও চাঁদ আধফোঁটা জ্যোৎস্নায় পাশাপাশি কত কথা বলে চলেছে। যেসব কথা পরোক্ষভাবে কবি ও কবিপ্রিয়ারই কথা। কার্তিক মাসের সাজানো এমন পরিবেশে 'কতদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজনে;'[২]। 'কত দিন সন্ধ্যার' - এই কবিতায় ফ্রয়েডীয় লিবিডো তত্ত্ব দেখা দিয়েছে।

প্রেমিক কবি জীবনানন্দ নারী ও প্রকৃতিকে ঘিরে ঋতুর বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অনুভূতিকে হাতিয়ার করে প্রকৃতি ও নারীর অনিন্দিত রূপ নির্মাণ করেছেন। মৌমাছির সঙ্গে কিশোরীর ও ভিড় লক্ষ্য করেছেন তিনি। শঙ্খের মতো স্তন, হলুদ শাড়ি, ক্ষীরের মতো তুলতুলে দেহ, অপরূপ নারী মন — এসব কবির কাছ থেকে কবে যেন অতীত হয়েছে। তবুও কবির কাছে এদের ম্লান চুল, ধূসর হাতের রূপ, এদের হৃদয় — সবকিছু কবিতা হয়ে ধরা দিয়েছে। আর এসব কবিতা লিখেছেন কোন না কোন ঋতুকে সঙ্গী করে। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন —

"এসব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা;
চালতার পাতা থেকে টুপটাপ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির;
কুয়াশায় স্থির হয়েছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর;
বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা
আকাঙ্ক্ষার; নিভু দীপ আগলায়ে মনোরমা দিয়ে গেছে দেখা
সঙ্গে তার কবেকার মৌমাছির .... কিশোরীর ভিড়
আমের বউল দিল শীতরাতে; — আনিল আতার হিমক্ষীর;
মলিন আলোয় আমি তাহাদের দেখিলাম; — এ কবিতা লেখা।"[২]

সন্ধ্যার নির্জনতায় কবি পৃথিবীর রূপকে গভীর চেতনা দিয়ে অনুভব করেছেন। শীত রাত্রির জ্যোৎস্নার নীরবতায় কবি শুনেছেন লক্ষ্মীপেঁচার আহবান। এই শীতের রাতে কবির মৃত্যুচেতনা জেগে উঠেছে। পাড়াগাঁর পথ বেয়ে নেমে আসে ঘুমের জগৎ। যেমন করে চুপিসারে অশ্বত্থের ঝাউপাতায় নেমে আসে রাতের ঘুম।

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৩৬
২। তদেব;পৃ. - ১৩৭

প্রাণের স্রোতের মধ্যে এভাবেই নেমে আসে চিরঘুম। কবি বলেছেন, যেমন ঘুমায় মৃতা, - যেমন ঘুমায় তার বুকের শাড়ি। এইভাবে মৃত্যুর করাল ছায়া এসে পড়েছে জীবনানন্দের কবিতাগুলিতে। 'একদিন যদি আমি' কবিতায় শীতঋতু এসেছে এভাবে, —

" — শেষ রাতে পৃথিবীর অন্ধকারে শীতে
তোমার ক্ষীরের মতো মৃদু দেহ - ধূসর চিবুক, বাম হাত
চালতা গাছের পাশে খোড়ো ঘরে স্নিগ্ধ হয়ে ঘুমায় নিভৃতে,"[১]

শীত ঋতু জীবনানন্দের কাছে সবসময় মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করেনি। অনেক সময় শীতের স্নিগ্ধতা ও কোমলতা তাঁর ভালো লাগার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি মনে করতেন, সবুজ ঘাসের বুক থেকে তাঁর নবজন্ম হয়েছে। তাই পথে পথে ঘাসকে ছুঁয়ে তিনি জলের মত স্নিগ্ধতা অনুভব করেছেন। কখনো কখনো ঘাসের বুকের ভেতর কুমারীর শ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করেছেন। আসলে একবিতায় শীতের অনুভূতি কবিকে সহজ, সরল সৌন্দর্যের নরম অনুভূতি দিয়েছে। কবি জীবনানন্দের মতোই কবির প্রিয়জনদের কাছেও এই শীত অত্যন্ত ভালো লাগার বিষয় হয়ে উঠেছে। শীতরাতের কোমলতা মধুরতাকে কবি সাদরে তুলে ধরেছেন এভাবে, —

"সান্ত্বনার নিভৃত নরম কথা - মাঠের চাঁদের গল্প করে —
আকাশের নক্ষত্রের কথা কয়;— শিশিরের শীত সরলতা
তাহাদের ভালো লাগে, — কুয়াশারে ভালো লাগে চোখের উপরে;
গরম বৃষ্টির ফোঁটা ভালো লাগে;শীতরাতে - পেঁচার নম্রতা;
ভালো লাগে এই যে অশ্বত্থ পাতা আমপাতা সারা রাত ঝরে।"[২] (ঘাসের বুকের থেকে)

বুদ্ধ দেব বসু জীবনানন্দকে অভিধা দিয়েছিলেন 'নির্জনতম কবি'[৩]। কবিকে নির্জনতার মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অনুভব করতে দেখেছিলেন। জীবনানন্দের মতো কবি বুদ্ধ দেব বসুও একসময় হিম নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'য় আহবান জানিয়েছেন এভাবে —

"এসো, শান্ত হও;এই হিম রাত্রে, যখন বাইরে-ভিতরে কোথাও
আলো নেই,
তোমার শূন্যতার অজ্ঞাত গহবর থেকে নবজন্মের জন্য
প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।"[৪] (শীতরাত্রির প্রার্থনা)

জীবনানন্দের মতোই বুদ্ধ দেব বসু ও শীতঋতুকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বরফের মতো শীত রাত্রি কবির কাছে ভয়াবহ হয়েছে। শীতের উত্তুরে কনকনে হাওয়া ঠিক যেন ডাইনির চাবুক। শীতের মৃত্যু নৃত্যের ভঙ্গিতে চাঁদকে কাগজের মতো টুকরো করে কুয়াশার মধ্যে ছিটিয়ে দেয়। শীতের দীর্ঘ রাত্রির ভেতর ঘাস পাতা - ফুল সবই ধবধবে তুষারের তলায় প্রাণ হারায়। রোদ নিভে গেলে আলোর পৃথিবীকে ঘন অন্ধকারময় কুয়াশা আক্রমন করে। বুদ্ধ দেব বসুর এই শীত ঋতু বাংলার নয়, - মেরু প্রদেশের। মেরু হাওয়ার 'আততায়ীর ছুরির মতো শীত' এর আঘাত কবিকে ক্ষান্ত করতে পারেনি, বরং সৃষ্টিশীল কবি মৃত্যুত্তীর্ণ ভাবনায় পরবর্তী ঋতু বসন্তের অথবা পরবর্তী প্রজন্ম বা নবজন্মের প্রতীক্ষা করেছেন। কবি ভবিষ্যতে আকাঙ্ক্ষা করেছেন, কুয়াশায় আচ্ছন্ন তারারা আবার জ্বলে উঠবে, মৃত্যুকে দীর্ণ করে বরফের কবরে ফুটে উঠবে ফুল, দেখা দেবে সবুজের উল্লাস। এসব ভাবনায় জীবনানন্দের সঙ্গে বুদ্ধ দেব বসুর মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৩৯
২। বুদ্ধ দেব বসু, কালের পুতুল / নিউ এজ, ১৯৯৭, মে / কলিকাতা - ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২৮
৩। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৪০
৪। তদেব;পৃ. - ১৪১

'রূপসী বাংলা'র অন্তর্গত সবকিছুই জীবনানন্দের মনকে নাড়িয়ে দেয়। বৃষ্টির রূপালি জল কবির খুব ভালো লাগে। বৃষ্টির জলে কতদিন কবির শরীরকে বৃষ্টির জল কুমারীর মতো আবেগ ভরা ভালোবাসায় ধুয়ে দিয়েছে। কবির চুল, চোখ, ঠোঁট স্পর্শ করেছে বৃষ্টির রূপালি জল। সবুজ ঘাসে রৌদ্রের দিনে ফিঙা যেমন প্রকৃতিকে প্রাণভরে ভালেবাসে, তেমনি বৃষ্টির জল গোপন প্রেমের মতো কবির চোখের উপরে ঝরে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে জীবনানন্দের ভাবনার মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানে রয়েছে —

'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে
চোখের পরে মুখের পরে'[১]

জীবনানন্দের এই অংশটি তুলনীয় ঃ

" — তেমনি গোপন প্রেমে এই জল ঝরে
আমার দেহের পরে আমার চোখের পরে ধানের আবেশে
ঝরে পড়ে, — "[২] (এই জল ভালো লাগে)

জীবনানন্দ এই কবিতায় আরও বলেছেন, যখন অঘ্রাণ রাতে ক্ষেতভরা ফসল হলুদ হয়ে যায়, তখন জামের ডালে পেঁচারা নরম হিমগান গাইতে থাকে। বনের প্রান্তে ধান, শালিক্ষুদ যেমন শান্তভাবে নীরবে ঝরে পড়ে, তেমনি কবি বলেছেন —

"তেমনি ঝরিছে জল আমার ঠোঁটের পরে — চোখের পাতায়
আমার চুলের' পরে; — অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আতায়
রেখেছে নরম হাত যেন তার — ঢালিছে বুকের থেকে দুধ।"[৩]
(এই জল ভালো লাগে)

'এই পৃথিবীতে আমি' কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের পাশাপাশি বিষণ্ণতার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। প্রেমের আশায় কবি আহরণ করেছেন কাঁটাবহরের ফল। প্রেমিক কবি কিশোরীকে দেখেছেন ভালো-মন্দলাগার অনুভূতিতে। তাঁর কিশোরী কখনো হলুদ করবী ছিঁড়ে নেয়, কখনও তার বুকের লাল পেড়ে ভিজে শাড়ি করুণ শঙ্খের মতো মূর্ত্তি নেয়। সবুজ ঘাসের উপর বসে কবি দেখেছেন রাঙা শার্টিনের মতো মেঘ শূন্য কুয়াশায় মুছে যায়। কার্তিকের রোদে মাঠ কখনো ক্ষান্ত হয়। —এই সব পৃথিবীর নানা দৃশ্য ফড়িঙের মতো ঘুরে বেড়িয়ে অনুভব করেছেন। কখনো ঘাসের উপর বসে একা একা উপলব্ধি করেছেন : "এইসব সাধ নিয়ে; আসিবে ঘুম তারপর, ঘুমাব তখন।"[৪]

'রূপসী বাংলা'র কবি জীবনানন্দ বারোমাসের প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে কবিতায় গ্রহণ করেছেন। কবি জীবনানন্দ 'কোনোদিন দেখিব না' কবিতায় প্রিয়াকে হারিয়ে অভিমান প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, প্রতিটি নক্ষত্রের সঙ্গে জেগে প্রিয়ার অনুসন্ধান করেছেন। কবি হৃদয়ে গভীর বিশ্বাস নিয়ে দেখেছেন আজও অশ্বত্থ শাখা দোলা দেয়, রাত্রির অন্ধকারের পর আলো আসে, ভোর হয়। তবুও সে আসে না, কিন্তু তাঁর প্রিয়া ফিরে আসে না। কারণ 'সে যে রূপ নিয়ে চলে গেছে দূরে' (হায়চিল)। তাই অভিমানী কবি বলেন —

"কোনোদিন দেখিবনা তারে আমি; হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে
কালো মেঘ নিঙড়ায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে উচ্ছ্বাসের গান
সারারাত-, ।"[৫]

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গীতবিতান / বিশ্ব সাহিত্য ভবন ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা - ৮২
২। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৪১
৩। তদেব;পৃ. - ১৪১
৪। তদেব;পৃ. - ১৪৪
৫। তদেব;পৃ. - ১৪৬

ব্যথিত স্বরে কবি বলেন, তাঁর প্রিয়া আর কোনদিন ফিরে আসবেনা, কোন জ্যোৎস্না কিংবা কোনো প্রভাতেও না। কবি আক্ষেপ করে বলেছেন, বেণুবনের উচ্ছ্বসিত গানে, অন্ধ সাপচরা গলি পথ বেয়ে, কিংবা পুকুরের পাড়ে হাঁসিনের সাথেও তাঁর প্রিয়া ফিরবে না। অথচ প্রকৃতিতে চিরকাল ধূসর সন্ধ্যায়, ধুন্দুল লতাতে জোনাকি জ্বলবে, ঝিঁঝির ধবনি সারারাত ঘাসে ঘাসে কথা বলবে, শান্ত রাতের বাতাসে বাদুড় ভিজা পাখানায় ভর করে উড়ে বেড়াবে। প্রিয়ার প্রতি কবির আক্ষেপ,— 'তুমি, সখি, চলে গেলে দূরে তবু;'[১]।

কবির প্রিয়া পৃথিবী থেকে বিগত হয়ে গেছে। তবুও পৃথিবী আগের মতো আজও রূপসী। কাতর চোখ, বিমর্ষ ম্লানচুল, বিষণ্ন হৃদয়ে তিনি আজও এই জগতকে ভালোবাসেন, এই জগতের সবকিছু তাঁর এখনও ভালো লাগে —

"পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে,
পউষের শেষ রাতে আজো আমি দেখি চেয়ে আবার সে আমাদের দেশে
ফিরে এল; রং তার কেমন তা জানে ওই টসটসে ভিজে জামরুল,
নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো অস্ফুট আঙুল;—
পউষের শেষ রাতে নিমপেঁচাটির সাথে আসে সে যে ভেসে
কবেকার মৃত কাক"[২] (এইসব ভালো লাগে)

পৃথিবীতে আজ কবির প্রিয়া নেই, তবুও জানলার পাশে কবির জন্য নীরব সোহাগ আসে। আর আসে চির শান্তিদায়িনী প্রেম, —

"পৃথিবীর সবঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকশে আকাশে।"[৩] (সন্ধ্যা হয় — চারিদিকে)

জীবনানন্দের কবিতার জগৎ ঋতুভেদে আশ্রিত ও পরিপুষ্ট। প্রেম-প্রকৃতি-ইতিহাস-চেতনার অভিব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে ঋতুকালের হিসাব ধরেই ঘটেছে। যুগযুগ ধরে কবি সাহিত্যিকেরা সৃষ্টিশীলতার পথে ঋতুকেই গ্রহণ করেছেন। কবির প্রেরণা শক্তি যেমন নারীর প্রেম, তেমনি মানব ও প্রকৃতির বৈচিত্রময় প্রকাশের উৎস হল ঋতু। কবি-সাহিত্যিকেরা প্রেয়সী নারীর শারীরিক সৌন্দর্য্য, প্রেমাভিসার - এসবের উদ্দীপক হিসেবে ঋতুকেই স্বীকার করেছেন। জীবনানন্দের ঋতুভাবনা অন্যান্য কবিদের তুলনায় স্বতন্ত্র। ঋতুমুখী চিন্তাধারাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর কবিতাগুচ্ছতেই আত্মিক পরিত্রাণ পেয়েছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি ঋতুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গীর আস্বাদন করেছেন। ঋতুকে তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশ্লিষ্ট করে পাঠকের কাছে অনুভববেদ্য করে তুলেছেন। আসলে ঋতু অনুরাগী কবি ছোটবেলা থেকেই ঋতুর প্রতি আকর্ষণবোধ করেছেন —

"মনে পড়ে বরিশালে শীতের সেই রাতগুলো - যখন খুব ছোটো ছিলাম প্রথম রাতেই চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেত। সংসারের শেষ মানুষটির খাওয়া দাওয়া হলে তবে মা ঘরে ফিরবেন —। কিন্তু যত রাতই হোকনা কেন, মা ঘরে না ফিরলে দু-চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসলেও ঘুম প্রতিরোধ করে জেগে থাকতে চাইতাম, মা ঘরে এলে তবে ঘুমবো। খুব দেরিতে ঘরে আসতেন, চারি দিকে শীতরাত তখন নিথর নিস্তব্ধ। বাইরে পৃথিবীর অন্ধকার — অঘ্রাণ-পৌষের শীত।"[৪]

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৪৭
২। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৪৭
৩। তদেব;পৃ. - ১৪৮
৪। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়;জীবনানন্দ দাশ;কবি ও কবিতা /ভারত বুক এজেন্সি ঃ কলিকাতা -৬,প্রকাশ-নভেম্বর,২০০০,পৃ.- ৫৭

জানা যায়, 'বর্ষা আবাহন' কবিতাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। ১৯১৯ এর বৈশাখমাসে 'ব্রহ্মবাদী' কাগজে শ্রী জীবনানন্দ দাশ বি. এ. প্রণীত ষোলো সংখ্যক - এ 'বর্ষা আবাহন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দের সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের ঋতুভাবনা রবীন্দ্র বলয়েই অবস্থান করেছিল। রবীন্দ্রযুগের একমাত্র কবি জীবনানন্দ, যিনি তাঁর কবিতায় ঋতুর প্রকাশ ও বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে ও অন্যভাবনায়। যদিও তাঁর প্রথম দিকের কবিতাগুচ্ছের উপর মোহিতলাল - সত্যেন্দ্রনাথ - নজরুলের প্রভাব টের পাওয়া যায়। তবুও বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের ঋতুর ভাবনা স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন রঙ নিয়ে তাঁর কবিতা বিকাশ লাভ করেছে। জীবনানন্দের ঋতুর অনুরাগ পঞ্চাশের, ষাটের, সত্তরের দশকের কবিদেরকেও মুগ্ধ করেছে। পঞ্চাশ দশকের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবনানন্দের পথকে অনুসরণ করেই হেমন্ত ঋতুর প্রতি গভীর আকর্ষণবোধ করেছেন। উভয় কবিই হেমন্ত প্রিয়তার মধ্যে প্রকৃতি তন্ময়তা ও মৃত্যুচেতনার অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন।

'বনলতা সেন' -এই সংকলনটিতে এসে প্রথম পেলাম পুরো পদবী জোড়া প্রেমিকার নাম পাওয়া যায়। বোঝা যায়, এ কবিতায় জীবনানন্দ বহুদিন প্রতীক্ষা করেছিলেন এই প্রেমিকার জন্য। তাই কবিতায় রয়েছে এমনই সম্ভাষণ সূচক প্রশ্ন: "এতদিন কোথায় ছিলেন?"[১] তাহলে কবির কি পূর্বপরিচিতা ছিলেন এই বনলতা সেন? -এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখতে পাই উপন্যাসের নায়কের কথা "কিশোরবেলায় যে কালো মেয়েটিকে ভালোবেসে"[২] গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে নেমেছিলেম, সেই বনলতা — "আমাদের পাশের বড়িতে থাকতো সে, কুড়ি-বাইশ বছরের আগের পৃথিবীতে।" শুধু তাই নয়, আরও জানিয়েছেন, বছর আষ্টেক আগেও সেই মেয়েটি এসেছিল একবার।

> "মা-পিসিমার সঙ্গে বলল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে
> আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নতমুখে
> মাঝপথে থেমে গেল তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক
> গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল
> সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের
> অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।
> তারপর তাকে আর আমি দেখি নি।"[৩]

কবির না দেখার কারণ কি, পৌষেই কি বনলতার মৃত্যু হয়েছিল? কবি জীবনানন্দ হয়তো দাহকালে উপস্থিত ছিলেন। কিশোরকালের সেই প্রেম অকালমৃত্যুর কবলে তলিয়ে গেলেও কুড়ি বছর পর শহুরে জীবনের সমস্ত পাট চুকিয়ে দিয়ে তিনি কিশোর প্রেমের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। ধান পাকার মাসে ফসলের মাঠে মাঠে ঘুরেছেন। কারণ —

> "আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি!
> আবার বছর কুড়ি পরে —
> হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
> কার্তিকের মাসে —
> তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে — তখন হলুদ নদী
> নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায় — মাঠের ভিতরে!"[৪]

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৫৩

২। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র /গতিধারা ঃ ঢাকা - ১১০০/প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০০০/পৃ.- ২৩১

৩। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র /গতিধারা ঃ ঢাকা - ১১০০/প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০০০/পৃ.- ২৩১

৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৫৩

মৃত্যুর ওপারে চলে গেছে কবির সেই রহস্যময়ী নারী। তাঁর কবিতায় সেই নারী হয়ে উঠেছে শঙ্খমালা, অরুণিমা, শেফালিকা, রূপকথার কন্যা শঙ্খমালা। জীবনানন্দের কাছে পৃথিবীর রাঙা, রূপসী কন্যাদের মধ্যে সে অন্যতমা নারী। যে নারীকে কবি দেখেছিলেন অঘ্রাণের অন্ধকারে, ধানসিঁড়িতে —

"কড়ির মতন শাদা মুখতার
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।"[১] (শঙ্খমালা)

একদিন 'পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য' হয়েছিল যে, সে হঠাৎ কবির স্মৃতিতে ফিরে এসেছে পৌষের জ্যোৎস্নায় অরুণিমা সান্যালের মুখ হয়ে।

"মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক

কল্পনার হাঁস সব - পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।"[২] (বুনোহাঁস)

নক্ষত্রভরা বিশাল আকশে উড়ে চলা বুনো হাঁসদলের মাঝখানে কবি দেখেছেন অরুণিমা সান্যালের কল্পপ্রতিম মুখ।

'হরিণেরা' কবিতায় শেফালিকা বোসকে পাবো। যার সুহাসিনী মূর্তি, কবি উন্মুক্ত প্রকৃতির আনন্দের উচ্ছ্বাসে দেখেছেন। রূপালী চাঁদের ফাল্গুন রাতে "হিজল ডালের পিছে অগনন বনের আকাশে" হীরের দীপ জ্বেলে সেখানে যেন হাসি মুখে উপস্থিত হয়েছে শেফালিকা বোস। বিলুপ্ত, ধূসর, হারিয়ে যাওয়া অতীত পৃথিবীর সেই শেফালিকা কবির মনে জেগে উঠেছে। তার সাক্ষী রয়েছে ফাল্গুনের সেই অপরূপ জ্যোৎস্না রাত্রি আর হরিণেরা —

"বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।"[৩] (হরিণেরা)

জীবনানন্দের আগের কাব্যগুলিতে প্রেমের অভিসার - অভিযানের বহু বর্ণনা থাকলেও, প্রেমিকার সুস্পষ্ট নাম ও শারীরিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। কবিতায় প্রেমিকা নারীর এই শারীরিক উপস্থিতি কবির লেখনী শক্তির বিমূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রেমচেতনায় পরিপূর্ণ 'বনলতা সেন' এর কবিতাগুলিতে প্রকৃতিলীন ঋতুময় আমেজ বিরাজ করেছে। ঋতুর সমাবেশে চিত্ররূপময় প্রকৃতিকে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' শুধু নয়, মানবিক অনুভূতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সুরঞ্জনা, সুদর্শনা, শ্যামলী, অরুণিমা, বনলতা, শেফালিকা, সবিতারা। কবির প্রেমজগতের প্রেয়সী ও শ্রেয়সী নারী এরা। এই নারীরা প্রেমের শাশ্বতবোধে উন্নীত। তাই পৃথিবীর বয়সিনী নারী 'সুরঞ্জনা'কেও তিনি সসম্মানে কবিতায় বরণ করতে পেরেছেন। প্রেমের শাশ্বতবোধ থেকেই তিনি বহু বছর পর এইসব নারীদেরকে কবিতার বিষয় করে তুলতে পেরেছেন। হেমন্ত ঋতুর আগমন

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৫৮
২। তদেব;পৃ. - ১৫৭
৩। তদেব;পৃ. - ১৫৮

যেমন কবির হৃদয়ের প্রেমের চেতনাকে দলিত মথিত করেছে, তেমনি হেমন্তের আগমনে বহু দিন পর পুরোনো স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন কবি। 'দুজন', 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' এবং 'কুড়িবছর পরে' কবিতাগুলিতে। দেখা যায় হৈমন্তিক বিষণ্ণতায় প্রেমবিবশ কবি অনুভব করেছেন ঃ " —অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;

সেসবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু;"[১] (অঘ্রাণ প্রান্তরে)

'দুজন' কবিতায় প্রেমিক তার প্রেমিকাকে খুঁজে পেয়েছে হেমন্তের মাঠে। এই কবিতার বিষয় হল প্রেম, আর উদ্দীপন বিভাব হল হেমন্ত ঋতু। এখানে প্রকৃতি জগতে ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নায়ক-নায়িকাদের মননেও হেমন্ত ঋতুর উপস্থিতি ঘটেছে —

"আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
প্রাণ তার ভরে গেছে।
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন;চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে;— "[২] (দুজন)

'বনলতা সেন' কাব্যের 'কুড়ি বছর পরে' কবিতায় নায়ক কার্তিকের ধান ক্ষেতে নায়িকাকে ফিরে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। হেমন্ত ঋতুই যেন নায়কের মনে জাগিয়ে তুলেছে অতীত প্রিয়ার স্মৃতি।

'আমি যদি হতাম', 'ঘাস' এদুটি কবিতায় প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে। ফাল্গুনের রাতে কবি হতে চেয়েছেন বনহংস এবং কবির প্রিয়া হবে বনহংসী। জলসিড়ি নদীর ধারে এক নিরালা নীড়ের ভেতর রচিত হবে তাঁদের মিলনের ফুলশয্যা। সেখানেই কবি হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব কবি জ্ঞান দাসের রোমান্টিক সুরের আকুলতাতে শুনতে পাই চিরন্তন ভাবনা -

"প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।"[৩]

জীবনানন্দের 'আমি যদি হতাম' কবিতায় সেই রোমান্টিক আকুলতার সুর ভেসে এসেছে। এখানে বনহংস ও বনহংসীর মধ্য দিয়ে কবি নিজের আকাঙ্খাকে প্রকাশ করেছেন।

"তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন —
নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালী ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশনীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।"[৪] (আমি যদি হতাম)

পরাবাস্তব সৌন্দর্যের ধ্যান ও অন্বেষণ করেছেন কবি জীবনানন্দ 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় পরাবাস্তব ভাবনা রয়েছে। ফাল্গুন মাসের আকাশে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে আলো ও অন্ধকার। ফাল্গুন মাস মধুমাস,

---

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৭৩
২। জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন / সিগনেট প্রেস;কলকাতা - ৭৩ / অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ, ১৪১০ / পৃ. - ৩০
৩। সুকুমার সেন ঃ বৈষ্ণব পদাবলী;কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ১৯৯ চতুর্দশ সংস্করণ, পৃ. - ৯১
৪। জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন / সিগনেট প্রেস;কলকাতা - ৭৩ / অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ, ১৪১০ / পৃ. - ১৪

তাই ফাল্গুনের নিবিড় অন্ধকারে মিলনের অনুষঙ্গ এসেছে। কবি বলেছেন, "যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে / অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি, / সে নারীর মতো / ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।"[১] যে নারীর অনুভূতি কবির সমস্ত সত্তা জুড়ে, সেই নারীর মুখ কবির কোন দিন দেখা হয়ে ওঠেনি। কেবল দেখেছেন, নগ্ন দুটি হাত, সেই নগ্ন দুটি হাতের কাছাকাছি রয়েছে গ্লাস ভর্তি মদ। ন্যাচারাল-সুপারন্যাচারালিজম্- এ কবিতায় রয়েছে। কবিতায় ফুটে উঠেছে অতীত দিনে প্রাসাদের কোন বাঈজী বা নর্তকী নারীর দৃশ্য —

"আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্যগালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃতচোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী —
এইসব ছিল সেই জগতে একদিন।"[২] (নগ্ন নির্জন হাত)

ফাল্গুনের অন্ধকার সমুদ্র পারের সেই অতীত কাহিনীকে মনে করিয়ে দেয়। 'রামধনু রঙের কাঁচের জানালা' এবং 'ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়'[৩] নর্তকী নারী মূর্ত্তির প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল পুরুষের। পুরুষ হৃদয়ের উষ্ণ রক্তক্ষরণ, গ্লাসে তরমুজের মতো রক্তিম রঙের পাশে নগ্ন হাত, উপরন্তু সময়টা হল 'ফাল্গুনের অন্ধকার' — এসব অনুভবের মধ্যে কবি পেয়েছেন অপ্রাপনীয়া প্রেমিকার কল্পমূর্তি। 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতার রহস্যকে, বিশ্বাস - অবিশ্বাসের পরিবেশকে কবি ফাল্গুনের অন্ধকারময় পটভূমিতে তুলে ধরেছেন। পরিবেশন করেছেন এক সমুদ্রপারের কাহিনী। কবিতায় তিনি জানিয়েছেন সুন্দর, দামী আসবাবপত্র, কমলারঙের রোদ্দুরের স্মৃতি, সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে যদি বাসনার নারীমুখ উপস্থিত না হয়। এ সম্পর্কে হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, — "তবু ফাল্গুনের অন্ধকার মাঝে মাঝে নিয়ে আসে এমন ব্যতিক্রমী মুহূর্তের মাত্রা। পৃথিবীকে মায়াবী নদীর পারের দেশ মনে হয় তখন। বস্তুত পৃথিবী ও বর্তমানের পর্দা কী এক অলৌকিক ইন্দ্রজালে উঠে যায়, কামনা আর কাতরতা, বাসনা আর বিষাদ, নস্ট্যালজিয়া এবং নৈঃশব্দ্য, যৌনতা ও মৌনতা, রোমান্টিকতা এবং রহস্য, কাঙ্খিত স্বপ্ন আর কান্না মিলেমিশে গিয়ে এক নতুন আয়তন লাভ করে। এই আয়তন দৃশ্যমান ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির বাইরে, অতি স্পর্শকাতর মন শুধু পায় তার খোঁজ, সকলে পায় না। ..... এবং এই ফাল্গুনের আঁধার, এ বসন্ত যদি রোদনভরা না-ও হয়, মধু-রাতের এ বিরহকে মধুর বলা যাবে কিনা সন্দেহ। যা একদিন ছিল, কিন্তু আজ নেই, স্মৃতি কিংবা স্বপ্নে ছাড়া থাকে আর পাওয়া যাবে না কখনো, নিষ্ঠুর সময় বা লুঠ করে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত, তারপর একদিন সকালে, অনিবার্যভাবে সব মরে যাবে, স্মৃতির সমস্ত সঞ্চয়, স্বপ্নের শেষ কপর্দক, সমস্ত ম্যাজিক মরে যাবে সর্বনাশা কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে, একদিন - একথা জেনে কোনো বিরহই মধুর হতে পারে না।"[৪] এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রহস্যময়ী নারীর মতোই বসন্তের প্রকৃতিও কবিকে ছলনা করে গেছে। যেহেতু সেদিন নারী ও প্রকৃতি পাশাপাশি অবস্থান করেছিল —

"অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;"[৫]। (নগ্ন নির্জন হাত)

১। জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন / সিগনেট প্রেস;কলকাতা - ৭৩ / অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ, ১৪১০ / পৃ. - ১৯
২। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯
৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯
৪। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়;আমার জীবনানন্দ/বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ;কলকাতা - ৯/ পুনর্মুদ্রণ;রথযাত্রা-১৪১৫/ পৃ. - ৫৮
৫। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৫৮

'বিড়াল' কবিতায় জীবনানন্দ মায়াবী জগৎ রচনা করেছেন। একটি বিড়াল কেমন করে হেমন্তের সন্ধ্যা'তে জাফরান রঙের নরম সূর্যের শাদা থাবা বুলিয়ে দিল, সূর্যের মধ্য থেকে অন্ধকারের ছোট ছোট বলকে সারা পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো— তাই কবি লক্ষ্য করেছেন, অতিলৌকিক কর্ম সম্পাদনকারী এই বিড়ালটি কবির বাস্তব জগৎ থেকে যেন হারিয়ে গেছে। কবি বিড়ালটিকে সারাদিন বিভিন্ন সময়ে ঘুরে ফিরে লক্ষ্য করেছেন। বিড়ালকে গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার উপর চলাফেরা করতে দেখেছেন। কয়েক টুকরো মাছের কাঁটা পেয়েই সে যেন খুশী, নিজেকে সফল মনে করেছে। সফলতার পরেই শাদা মাটির কঙ্কালটি কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়ে নখদিয়ে আঁচড় কেটেছে। জীবনানন্দের মনসৃষ্ট বিড়ালটি হেমতের কোন এক দিনে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা কার্যকলাপে এইভাবে মত্ত থেকেছে।

"জীবনানন্দের কাব্যে সূর্য চেতনার, বোধের প্রতীকও। চৈতন্য বিযুক্ত বিড়াল তাই চৈতন্যরূপ সূর্যের পিছনে ছোটে। দুর্লভের স্বপ্নে সে বিভোর। কিন্তু পাওয়া যায় না। বরং এক ছলনার শিকার হয় সে। হৈমন্তিক সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত - 'জাফরাণ - রঙের সূর্যের নরম শরীরে' সে থাবা বুলায়। সূর্য নয়, সূর্যের ছায়াকে নিয়ে সে প্রাপ্তির আনন্দে খেলা করে। তারপর ভয়ঙ্কর সত্য উদঘাটিত হয়। ঠিক যেভাবে "রক্তকরবী"র রাজা জানতে পারেন মরা যৌবনের অভিশাপ তাকে লেগেছে; তিনি প্রতারিত। তখনই শুরু হয় চরম ভাঙনের খেলা। বিড়ালও যে মুহূর্তে জানে, তার জন্য কোনো সূর্য নেই, তখনই সে ফিরে যায় তার আদিমতার অন্ধকারে। তারপর অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে, সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

গ্যেটের মেফিস্টোফেলিসও জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে কামলোভের অন্ধকারে রাজা হয়। সেই অন্ধকার রাজত্বে ফাউস্টকেও সে টেনে আনে। ব্যর্থ বঞ্চিত মানুষ মাত্রই প্রতিশোধ পরায়ণ, বিড়ালও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই নিজে যে আলো থেকে সে বঞ্চিত অন্যদের সে সেই আলোর মুখ দেখতে দিতে চায়না। তাই রাশি রাশি অন্ধকার সে ছড়িয়ে দেয়। ঈর্ষাকাতর, হীনচেতা মানুষেরা যেমন 'বসন্তের কোকিল', তেমনি 'বিড়াল' - ও হতে পারে। কবি তেমনই বিড়ালের দেখা পান বারবার, ঘুরে ফিরে।"[১]

জীবনানন্দ জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 'অন্ধকার' কবিতায়। অন্ধকারে কবি চিরকাল ঘুমিয়ে থাকতে চান।

"ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম — পউষের রাতে —
কোনোদিন আর জাগবনা জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি — কোনোদিন জাগবনা আর —
আমাকে জাগাতে চাও না যেন।"[২] (অন্ধকার)

পউষের রাতে কবি জীবনের মিথ্যা প্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে সরিয়ে চির ঘুমের মধ্যে নিবিষ্ট হতে চেয়েছেন। স্বপ্ন, উদ্যম, দিনের আলোর মধ্যে কোনরকম আর আকর্ষণ বোধ করেননি। মৃত্যুর মধ্যে শান্তি ও শীতলতাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি। প্রবহমান জীবনকে যন্ত্রনার প্রদাহ বলে মনে হয়েছে কবির। তিনি দেখেছেন পৃথিবীতে চলছে ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রার চলমান প্রবাহ।

১। তরুণ মুখোধ্যায়;কবি জীবনানন্দ অনুভবে অনুধ্যানে/প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৯ / তৃতীয় সংস্করণ;জুন, ২০১০/ পৃ. - ১৪৫
২। জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন / সিগনেট প্রেস;কলকাতা - ৭৩ / অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ, ১৪১০ / পৃ. - ২৬

"শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এইসব ভয়াবহ আরতি!"[১]

এই ঘুম থেকে হিম হাওয়ার শেলসম স্পর্শে কিংবা মাঘনিশীথের কোকিলের ডাকে কবি জেগে উঠতে চান না। তিনি নিজেকে মূর্খ পৃথিবীর জীব বলে মনে করেছেন। সমস্ত ঘৃণা, বেদনা, আক্রোশে অনন্ত মৃত্যুর মতো অন্ধকারের মধ্যে তিনি মিশে থাকতে চেয়েছেন। শীতের রাতে কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে একটা হিম কমলালেবু হাতে শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েছে কল্যাণীয়া নারী। মঙ্গলময়ী এই নারীর স্পর্শ পাওয়ার বাসনায় নায়ক আশা করেছেন, "আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে? আবার যেন ফিরে আসি।" যখন নায়ক তার অপ্রাপনীয়াকে পাবেন —

"কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।"[২] (কমলালেবু)

তখন নতুন জীবনের আনন্দে মেতে উঠবেন।

'ধানকাটা হয়ে গেছে' কবিতায় অতীত প্রেমের স্মৃতি শীত ঋতুর চেতনায় আলোড়িত হয়েছে। নারীর শারীরিক উপস্থিতি নেই, কিন্তু তার প্রেমের ছায়া কবির চেতনায় গভীরে আলোড়ন সঞ্চার করেছে। পরিপূর্ণ কায়া নেই, তবু তাদের অস্তিত্ব থেকেই গেছে। যেমন ধান কাটার পর ফসল শূন্য মাঠে পড়ে থাকে অবশিষ্ট খড়, সাপের খোলস, যা অনড় অচল হয়ে ওখানেই পড়ে থাকে, তেমনই ঃ

"ওইখানে একজন শুয়ে আছে — দিনরাত দেখা হত কতকত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার সাথে করেছি যে কতখেলা .....
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।"[৩]

'ধানকাটা হয়ে গেছে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ শীত ঋতুর চিত্র অঙ্কন করেছেন এভাবে। প্রখ্যাত সমালোচক জীবনানন্দের শীত ঋতুর প্রতি আকর্ষণ দেখে মন্তব্য করেছেন —

" 'পৌষ সন্ধ্যা' এবং 'অঘ্রাণের অন্ধকারে' কবি দীর্ঘ শীত রাত ভালোবেসেছেন। কবিতাটির ভিত্তিমুহূর্ত আসন্ন সন্ধ্যা, অবস্থান ভূমি শস্যরিক্ত শীতমাঠ। বাংলার এমন রূপকে ইন্দ্রিয়জ ভালোবাসা দিয়ে এর আগে কেউ দেখেনি।"[৪]

প্রেমের এই শাশ্বতবোধ থেকেই স্বপ্নের ধবনিরা এসে বলে যায় ঃ

"নিস্তব্ধ শীতের রাতে দীপ জ্বেলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
..... শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রবো বিছানায় শুয়ে;"[৫] (স্বপ্নের ধবনিরা)

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৬২
২। জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন / সিগনেট প্রেস;কলকাতা - ৭৩ / অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ, ১৪১০ / পৃ. - ২৮
৩। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৬৮
৪। গোকুলানন্দ মিশ্র ঃ জীবনানন্দের কবিতা জিজ্ঞাসায়;বিশ্লেষণে/প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-৯ / দ্বিতায় সংস্করণ;অঘ্রাণ, ১৪১৯ / পৃ. - ৫৯
৫। জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন / সিগনেট প্রেস;কলকাতা - ৭৩ / অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ, ১৪১০ / পৃ. - ৩৩

কবির প্রিয়া প্রেম-অপ্রেমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে কবির থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ইহলৌকিক জগতে আর কবির প্রিয়া নেই, কবির প্রিয়া দাঁড়িয়েছে এখন মৃত্যুর ওপারে। কবির ভাবনায় তাঁর প্রিয়া মাটির অনেক নিচে অথবা আকাশের পারে পৌঁচেছে। প্রিয়াকে পাশে না পেয়ে কবির আকুলতা —

"আমার এমন কাছে — আশ্বিনের এত বড়ো অকূল আকাশে
আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অনায়াসে —"[১] (তুমি)

তিনি দেখেছেন আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, গঙ্গাফড়িং, কাঁচপোকারা চিরঘুমে আচ্ছন্ন। প্রান্তরের ঘাস তাই মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী নীলাভ রূপ নিয়েছে। চিরঘুমে আচ্ছন্ন কবির প্রিয়া প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতোই কবিকে বলতে হয়েছেঃ "আমি নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।"[২]

'সিন্ধুসারস' কবিতার সিন্ধুসারস মানব মনের গভীর বেদনার সঙ্গী হয়েছে। কবিতার কথক 'তুমি' সম্বোধন করেছেন সিন্ধুসারসকে। ক্লান্ত পৃথিবীর বুকে আনন্দ সৃষ্টি করার মতো শক্তি রয়েছে সিন্ধুসারসের। ভয়ংকর যুদ্ধের দহনে মানবমনের আনন্দ হারিয়ে গেছে। ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান — এককথায়, মানব হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত,সমস্ত অনুভবের মাঝেই প্রশ্ন আর চিন্তার অসহ্য আঘাত সৃষ্টি হয়েছে। সিন্ধুসারসের মতোই কবি নায়ক মনে করেন অতীতকে, স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরার মতো কিছুই নেই মানব জীবনে। সিন্ধুর কোলে সিন্ধুসারস ও কবিতার কথক — উভয়েই দু-এক মুহূর্ত পাশাপাশি অবস্থান করেছে। সিন্ধুসারসের গীতধ্বনি প্রেমিকের মনে জাগিয়েছে, "পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ / পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই"[৩]। বিষণ্ণ, ক্লান্ত পৃথিবী ছেড়ে সিন্ধুসারস যাত্রা করেছে "শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।"[৪] তাই সিন্ধুসারসের নেই, —

"পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে
ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।"[৫]

অন্ধকার, ক্ষুধা, বিবরের মতো কুৎসিত হাত পৃথিবীর সৌন্দর্যকে নষ্ট করে। কিন্তু সিন্ধু সারসের গীতধ্বনির মধ্যে রয়েছে সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ, শাদা রৌদ্রের মতো স্বচ্ছতা এবং নতুন সমুদ্রের মতো উল্লাস। স্বার্থান্ধ মানুষ বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ এবং প্রেমিকের ম্লান নিঃসঙ্গ মুখের মতো রূপ নিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে —

"গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের — ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।"[৬] (সিন্ধুসারস)

'সিন্ধুসারস' কবিতার বক্তব্য পুরোটাই স্মৃতিতে পরিপূর্ণ।

যুদ্ধ বিধবংস পৃথিবীতে মনুষ্য হৃদয় ব্যথাদীর্ণ হয়েছে। কাজের মধ্যে উদ্যম, প্রেমে আবেগ, সফলতায় স্বপ্নকে খুঁজে পাচ্ছেনা মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য আর হাতছানি দেয় না মানুষের আবেগ ঘন মুহূর্তকে। শান্তিকামী মানবহৃদয় আজ মৃত্যুমুখী। "নিরালোক" কবিতায় জীবনানন্দ বসন্তের পরিবেশে অনুভব করেছেন :

"বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে — বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।
অনেক নক্ষত্র ভ'রে গেছে সন্ধ্যার আকাশ - এই রাতের আকাশ;
এইখানে ফাল্গুনের ছায়া-মাখা ঘাসে শুয়ে আছি;
এখন মরণ ভালো, — শরীরে লাগিয়া রবে এই সব ঘাস;
অনেক নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকছি।"[৭] (নিরালোক / মহাপৃথিবী)

১। জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন / সিগনেট প্রেস;কলকাতা - ৭৩ / অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ, ১৪১০ / পৃ. - ৩৬
২। তদেব;পৃ. - ৩৬
৩। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৭৮
৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৭৮
৫। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৭৮
৬। তদেব;পৃ. - ১৭৮
৭। তদেব;পৃ. - ১৭৭

নক্ষত্রভরা আকাশের নীচে কবি বেঁচে থাকার কোন স্বাদ-আহ্লাদ অনুভব করেন না। তাই স্নিগ্ধ ছায়ামাখা ফাল্গুনে কবি তাঁর মৃত্যু চেয়েছেন।

বর্ষাঋতুর প্রেক্ষিতে বিপন্ন পৃথিবীর অবস্থা তুলে ধরেছেন 'শ্রাবণরাত' কবিতায়। শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাত কবিকে নিদ্রাহীন করে দিয়েছে। মহাপৃথিবীর "মাইলের পর মাইল মৃত্তিকার নীরবতা" অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘ, কবির মনে ঝাপসা অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। সশঙ্ক মানবাত্মা, বিপদশঙ্কুল পৃথিবীর চিত্র তিনি 'শ্রাবণ রাত' কবিতায় নির্মান করেছেন। সন্ত্রস্ত কবির মনে হয় শ্রাবণ রানে —

"মনে হয়
কারা যেন বড়ো বড়ো কপাট খুলছে,
বন্ধ করে ফেলেছে আবার
কোন দূর - নীরব - আকাশ রেখার সীমানায়।"[১] (শ্রাবণরাত)

'শীতরাত' কবিতায় জীবনানন্দ মৃত্যুর হাতছানি অনুভব করেছেন। পৃথিবীর কুৎসিত রূপ দেখে আতঙ্কিত হয়েছেন তিনি। কবি পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যকে হারিয়ে যেতে দেখেছেন মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে। শীতরাতে প্যাঁচার গান, শিশির কিংবা হলুদ পাতা — এসবই মৃত্যুর সংকেতবাহী। এমনকি কোকিলের মধুর ধবনিকে কবি বলেছেন,

"এদিকে কোকিল ডাকছে — পউষের মধ্যরাতে;
কোনো একদিন বসন্ত আসবে বলে?
কোনো একদিন বসন্ত ছিলো, তারই পিপাসিত প্রচার।"[২] (শীতরাত)

এ কবিতাতে মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করেছে শীত ঋতু। জীবনানন্দ একাধিক কবিতায়, শীত ঋতুকে নির্দেশ করেছেন মৃত্যু চেতনার ইঙ্গিতবাহী হিসেবে। 'স্থবির-যৌবন' কবিতায় শীতের জড়তার মধ্যেই মৃত্যুদূতের উপস্থিতি দেখিয়েছেন। নারীর যৌবন নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোনা, রূপা, মসলিন শাড়ি এমনকি একান্ত হৃদয় সঙ্গী তার যুবাও প্রত্যাখান করে নারীকে। তখন বিগত যৌবনা নারীর অঙ্গের ভূষণ স্খলিত হয়। কবির ভাষায় —

"শীতের বাতাস নাকে চলে গেলো জানালার দিকে,
পড়িল আধেক শাল বুক থেকে খসে;
সুন্দর জন্তুর মতো তার দেহকোষে
রক্তশুধু? দেহ শুধু?"[৩] (স্থবির - যৌবন)

'মহাপৃথিবী' সংকলনে তিনি পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু রূপ লক্ষ্য করেছেন। পৃথিবীর বুক থেকে নিসর্গ প্রকৃতির রমণীয়তা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। অতীত ঋষিদের শান্তির ললিত বাণী আর নেই এখানে। চারিদিকে তিনি শুধু দেখেছেন মৃতবৎসা, মাতাল, ভিখারি ও কুকুরদের ভিড়। প্রেমের মধ্যে দেখেছেন হিংস্রতার থাবা লাফিয়ে পড়ছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য মুছে গেছে স্বার্থান্ধ লোলুপতার মধ্যে। বিভিন্ন বর্ণের মানুষেরা

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৮০
২। তদেব;পৃ. - ১৮৬
৩। তদেব;পৃ. - ১৮৮

হৃদয়ের সততাকে অদৃশ্য করে ফেলছে। সব মিলিয়ে পৃথিবীর ভয়ংকর রূপ দেখেছেন তিনি। 'রূপসী বাংলা'র কবি আজ দেখলেন, —

"বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কতবার দেখলাম
কত বালিকাকে নিয়ে গেলো বাঘ — জঙ্গলের অন্ধকারে;
কতবার হটেনটট — জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম;।"[১] (আজকের এক মুহূর্ত)

'ফাল্গুনের রাত' কবিতাটি জীবনানন্দের এক বিশেষ ভাবনার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন কবিতায় জীবনানন্দ ফাল্গুন মাসকে পৃথক পৃথক পরিস্থিতির দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় কথক জানাচ্ছেন যে — 'ফাল্গুনের রাতের আঁধারে' লোকটির মরবার সাধ হয়েছিল। আবার কোথাও ঃ "ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী" (নগ্ন নির্জন হাত / বনলতা সেন)। কিংবা, "তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে / ঝাউয়ের শাখার পিছনে চাঁদ উঠতে দেখে" (আমি যদি হতাম/বনলতা সেন) এই ফাল্গুনের রাতের আঁধারে মানবজীবনের এক 'বিপন্ন বিস্ময়' আনে —

"জীবনের এই স্বাদ — সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের —
তোমার অসহ্যবোধ হল; —।"[২]
(আটবছর আগের একদিন / মহাপৃথিবী)

লোকটি বিছানায় শুয়েছিল বধূ এবং শিশুর সঙ্গে। ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তখনও চাঁদ ডোবেনি, ঠিক সেই সময় জ্যোৎস্নায় লোকটি দেখেছিল মৃত্যুর মুখ। চাঁদ ডুবে যাবার পর জীবনের প্রেম, আশা, স্বপ্ন — সবই তলিয়ে গেল অদ্ভুত এই ফাল্গুনের অন্ধকারে। ক্লান্তির অবসন্নতায় বিনিদ্র রাতে লোকটির কাছে হাজির হল মৃত্যুর কুৎসিত চেহারা। কবিতার শুরুতেই, ফাল্গুনের জ্যোৎস্না নিভে গিয়ে অন্ধকারময় করে তুলেছে লোকটির জীবনকে। প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য বা পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার প্রতি কোনরকম আকর্ষণবোধ করেনি লোকটি। তাই ঃ

"শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কালরাতে - ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হল তার সাধ।"[৩] (আটবছর আগের একদিন)

কবির ভাষায় পৃথিবীতে অন্ধকার শুধু মানুষের মনে নেমে আসেনি, ফাল্গুনের চাঁদ ডুবে গিয়ে প্রকৃতির কোলেও অন্ধকার নেমে এসেছে। ফলতঃ উজ্জ্বল পৃথিবী মলিন হয়েছে। কবি দেখেছেন সূর্যের শিখা আজ মৃত। সুস্থ প্রেম মানব জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। 'মনোবীজ কবিতায় তিনি বলেছেন, —

"পৃথিবীর বেদনার মতো ম্লান দাঁড়ালাম ঃ
হাতে মৃত সূর্যের শিখা,
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম;
অঘ্রাণের মাঠের মৃত্তিকা
হয়ে গেলো;
নাই জ্যোৎস্না - নাকো মল্লিকা।"[৪] (মনোবীজ / মহাপৃথিবী)

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৮৯
২। তদেব;পৃ. - ১৮৩
৩। তদেব;পৃ. - ১৮৩
৪। তদেব;পৃ. - ১৯২

জীবনানন্দ 'মহাপৃথিবী'র প্রত্যেকটি কবিতায় যুগ যন্ত্রনার ছবি অঙ্কন করেছেন। 'বনলতা সেনে'র অধিকাংশ কবিতায় যেমন আমরা দেখেছি রোমান্টিক স্বপ্নমনস্কতার ছবি। কবি 'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলিতে বুঝিয়েছেন, বেদনাদায়ক যন্ত্রনা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে গ্রহণ করা অনেক শ্রেয়। কারণ মৃত্যু যাবতীয় যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তি দেয়। তাই কবি মৃত্যুর শীতল স্পর্শ অনুভব করতে চেয়েছেন। 'এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে' (শীতরাত)। 'মহাপৃথিবী'র মানুষগুলি নারীহৃদয়, প্রেম, সন্তান - কোন কিছুর প্রতি জৈব আকর্ষণ বোধ করেননি। আত্মহত্যাকারী মানুষটির উপলব্ধি সম্পর্কে বলেছেন,

"হাড় হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ....."

অথবা — "জানি - তবু জানি
নারীর হৃদয় প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি ....।"[১]

বিস্ময়ের বিপন্নতা ব্যক্তির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করেছে। আধুনিক যন্ত্রযুগ, গতানুগতিক জীবন যাত্রা মানুষের ক্লান্তির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনা জীবনানন্দকে অসহায় করে তুলেছিল। পৃথিবীতে মানব জীবনের, গড্ডালিকা প্রবাহ আগের মতো চলমান হলেও বিবেকবান মানুষের হৃদয় বিপন্ন হয়েছে। ইতর প্রাণীর মতো তারা অবোধ আনন্দ অনুভব করার মতো উদ্যম পাচ্ছিলনা আর মানব জীবনে। 'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলিতে পৃথিবীর এবং মানব জীবনের বিপন্ন অবস্থার পরিচয় রয়েছে। 'সাতটি তারার তিমির' সংকলনের কবিতাগুলিতেও এই পরিস্থিতি অক্ষুন্ন ছিল। যুদ্ধ সন্ত্রস্ত পৃথিবীতে সাতটি তারা যুদ্ধের অন্ধকার এবং বিপন্ন হৃদয়কে আলোক পথের দিশারী করে তুলতে পারেনি। তাই চলমান সময়ের কাছে 'অফুরন্ত রৌদ্রের' পাশাপাশি এসেছে 'অনন্ত তিমির'। তিমিরের মধ্যে যেমন অন্ধকার জিজ্ঞাসা রয়েছে, তেমনি আলোকময় উত্তরণও রয়েছে এ কাব্যে। যুদ্ধ বিধবস্ত আবহমানতার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা জীবনানন্দের বিশিষ্ট অনুভব 'মহা পৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির' সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে।

যুদ্ধের পটভূমিতে জীবনানন্দের কবিতা ঐতিহাসিক প্রস্তর যুগের নিওলিথ স্তব্ধতার স্পর্শ খুঁজে পেয়েছে। জীবনানন্দের সমকালীন পরিস্থিতি যেন বিক্ষুব্ধ ইতিহাসেরই পুর্ণজাগরণ। —

"আমরা যাইনি মরে আজো - তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়:
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন — ....
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ — স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।"[২]

(ঘোড়া/সাতটি তারার তিমির)

কার্তিকের জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে পৃথিবীর প্রান্তর। মহীনের ঘোড়াগুলো চরছে প্রান্তরে। বর্তমান থেকে ঘোড়াগুলো অতীতে, অনেক অতীতে পিছিয়ে গেছে। আস্তাবলের ঘোড়াগুলিকে প্রস্তরযুগের সময় প্রবাহে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। চলমান জীবনের কাল বিপর্যয়ই কবির মনে পরিবর্তীত এই দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যেও কবি দেখেছেন রাত্রির ঘন অন্ধকার। দেখেছেন নগর জীবনের অবসন্ন রূপ। তবুও কবি ভয়ানক পরিস্থিতিকে পেছনে ফেলে সৌরকরোজ্জ্বল জীবনে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন। হেমন্ত ঋতু 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতায় অন্যরকম মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। হেমন্ত এখানে

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৮৩
২। জীবনানন্দ দাশ ঃ সাতটি তারার তিমির / অরুণা প্রকাশনী;কলকাতা - ৬ / সপ্তম মুদ্রণ;ফাল্গুন, ১৪১০ / পৃ. - ১০

এসেছে পৃথিবী পরিক্রমায় কালের নিয়মে। যুদ্ধ আর বাণিজ্যিক অভিসন্ধিতে দেশ-বিদেশের পুরুষেরা ভুলে গেছে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে।

"সেইখানে উঁচু উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল - রাঙা -
চুপে চুপে ডুবে যায় — জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দ্যাখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রূপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।"[১]

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে বহু চিত্রকল্প পরাবাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। চিত্রকল্পের নানা ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে প্রেম, প্রকৃতি, নিসর্গ ও মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তীত রূপ। জীবনানন্দের কবিতা শুধু 'চিত্ররূপময়' নয়, ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্পীর মতো রহস্যময়ও। আলোর রহস্যময়, বিস্ময়কর খেলা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, —

"নিসর্গ দৃশ্যমাত্রেই আলোর একটি স্থান আছে। ভোর, সকাল, দুপুর,
সন্ধ্যা, চাঁদনী বা আঁধার রাত, মেঘলা বা বর্ষণ-মেদুর দিন-আলোক
সম্পাতে দৃশ্যকে নানারূপ প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্পীরা
দৃশ্যকে পূর্ণাঙ্গ করতে আলো আঁকেন নি — আলোকেই বর্ণনীয় করে
তুলতে দৃশ্য এঁকেছেন, যেমন ক্লেদ মনে একই দৃশ্য বারবার আঁকতেন
শুধু সময়ের অনুযায়ী আলোর বৈচিত্র্য বোঝাতে।"[২]

ঋতুবৈচিত্র্যে হেমন্ত ঋতুই জীবনানন্দে ব্যাপ্ত হয়ে আছে সর্বাধিক। হেমন্ত ঋতুর বিচিত্র বর্ণনা ও ব্যঞ্জনা জীবনন্দের অনেক কবিতার অন্যতম লক্ষ্য হয়েছে। বিচিত্র পাখি প্রাণী ও কীটপতঙ্গের সঙ্গে হেমন্ত ঋতুর সমাবেশ বিশ্বকবিতার অভিধানে বিরল, যা জীবনানন্দের কাব্যে রয়েছে। ঋতুকে কেন্দ্র করে জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা বিভূতিভূষণের প্রকৃতির অনির্বচনীয় বর্ণনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

"চারিদিকে উঁচু উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা,
অনেকসময় ধরে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন হয়ে গেছে সে সময়ে নীলাকাশ বলে
সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল
মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে;
অথবা ঝাঁপির থেকে অমেয় খইয়ের রঙ ঝরে;"[৩] (হাঁস)

'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কিংবা 'হাঁস' কবিতায় হেমন্ত ঋতুর অম্লান সৌন্দর্য্য মায়াবী, রহস্যময়। এ প্রসঙ্গে

১। জীবনানন্দ দাশ ঃ সাতটি তারার তিমির / অরুণা প্রকাশনী;কলকাতা - ৬ / সপ্তম মুদ্রণ;ফাল্গুন, ১৪১০ / পৃ. - ১৪
২। অম্বুজ বসু : একটি নক্ষত্র আসে / পুস্তক বিপণী, কলকাতা - ৯ / চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪১১ , পৃ. - ১১৭
৩। জীবনানন্দ দাশ ঃ সাতটি তারার তিমির / অরুণা প্রকাশনী;কলকাতা - ৬ / সপ্তম মুদ্রণ;ফাল্গুন, ১৪১০ / পৃ. - ২৯

অম্বুজ বসু বলেছেন ঃ

"সাতটি তারার তিমিরে'র 'হাঁস' কবিতায় সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যার
নদীর ছবি আশ্চর্য আলোমাখা হয়ে আছে। ভোরে তার জলপাই
পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জল, দিনমানে জলের গভীরে শাদা মেঘ,
লঘুমেঘের ডুবে যাওয়া, বিকেলে অনেক সময় স্থির থেকে হেমন্তের
জল নীল আকাশ বলে প্রতিপন্ন হলো আবার অপরাহ্ণে খইয়ের
রঙের মতো রোদের ঝিলিক ঝরে পড়লো — সব মিলিয়ে আলোর
মায়াই দেখতে হবে।"[১]

'ঝরাপালক' থেকে শুরু করে জীবনানন্দ হেমন্ত ঋতুকে কতরূপে কতবার দেখিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তবুও প্রত্যেক কাব্যপর্যায়ে হেমন্ত ঋতু আপন স্বকীয়তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কখনো ফসল শূন্য মাঠে, কখনও জীবন ও মৃত্যুর অনুভবে, কখনো বিচিত্র ভাবভাবনার প্রতীকে রূপায়িত হয়েছে কবির প্রিয় হেমন্ত ঋতু। রক্তপাতের দেশের অধিবাসী হয়েও কবি হেমন্তের সোনালী হলুদ ফসলকে তিনি স্থিরভাবে দেখেছেন। উত্তমর্ণ দেবতাদের পথানুসরণে পবিত্র হৃদয়কে মদির করে তুলেছেন। কবির ভাষায়, —

"অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে
পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস;
উত্তেজিত না হয়েই অনায়াসে বলে যায় তারা;
হেমন্তের ক্ষেতে কবে হলুদ ফসল ফলেছিলো,
অথবা কোথায় কালো হ্রদ ঘিরে ফুটে আছে সবুজ সিঙাড়া।
রক্তাতিপাতের দেশে বসেও কাদের সেই প্রাঞ্জলতায়
দেখে যাই সোনালী ফসল, হ্রদ, সিঙাড়ার ছবি;।"[২] (চক্ষুস্থির)

'মহাপৃথিবী' কাব্য পর্যায়ে তিনি দেখেছিলেন নষ্ট পৃথিবীর চিত্র। সেখানে মানুষ হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করার মতো ধৈর্য্য দেখায়নি। 'সাতটি তারার তিমির'এ এসে কবির অনেকখানি ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। তিমিরের মধ্যে কবি সাতটি তারাকে দেখে সত্যতা, বিশ্বাসও, আলোক পথের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। বিশ্বাসভ্রষ্ট হওয়ার পরও জ্ঞান ও প্রেমের মিলনে উজ্জ্বল হয়ে ডঠেছে কবির চেতনা। মানব জীবনের সংকটকে উত্তীর্ণ করার আস্থা খুঁজে পেয়েছেন তিনি। তাই বলেছেন —

"আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই - পথ নেই বলে,
যথাস্থান থেকে খসে তবুও সকলি যথাস্থানে
রয়ে যায়;- শতাব্দীর শেষ হলে এ-রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে;- বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে :
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।"[৩] (বিভিন্ন কোরাস)

নারীদের উপস্থিতি জীবনানন্দের কবিতার ভাবনাকে বর্ণবহুল করে তুলেছে। যুদ্ধগ্রস্ত পৃথিবীতে "যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ / আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে" -। কবির স্থিরবিশ্বাস,

"দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে;.....
তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে।"[৪] (স্বভাব)

১। অম্বুজ বসু : একটি নক্ষত্র আসে / পুস্তক বিপণী, কলকাতা - ৯ / চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪১১ , পৃ. - ১১৪

২। জীবনানন্দ দাশ ঃ সাতটি তারার তিমির / অরুণা প্রকাশনী;কলকাতা - ৬ / সপ্তম মুদ্রণ;ফাল্গুন, ১৪১০ / পৃ. - ৩২

৩। তদেব;পৃ. - ৩৬

৪। তদেব;পৃ. - ৪০

হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে কবি স্মৃতিচারণ করেছেন যে, পৃথিবীতে একদিন শুভ সময় আসবে। অতীত দিনের মতো দিনগুলি মানুষের কাছে উজ্জ্বল হবে। আলোকসন্ধানী কবি নারীর কাছ থেকে এই বিপদ উত্তরণের প্রেরণা শক্তি পেয়েছেন।

'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে পৌঁছে কবি হেমন্ত ঋতুকে পরম বিশ্বাসের স্থল বলে মনে করেছেন। তিনি মনে করেছেন সৎ সংকল্পের অথবা সফলতার একমাত্র উপযুক্ত সময় হল "হেমন্তের বেলাবেলি দিন / নির্দোষ আমোদে সাঙ্গ করে ...."[১] (সোনালি সিংহের গল্প)। যুদ্ধ বিধবস্ত পৃথিবীতে জীবনসংগ্রামে সঙ্গী করেছিলেন হেমন্তের আলোকময়তাকে "হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।"[২] (তিমির হননের গান) কলকাতা মহানগরীর 'নিরুত্তর ফুটপাতে' কালো কালো বিষাদের ছায়া, মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশা, মৃত চোখ — এইসব অন্ধকারময় জীবনের অসহনীয়তাকে ধবংস করতে কবি গেয়েছেন 'তিমির হননের গান'। যে গান গাওয়ার শক্তি পেয়েছেন কবি হেমন্তের প্রান্তরে, জ্বলে ওঠা নক্ষত্রের আলোর কাছ থেকে—

"তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।"[৩] (তিমির হননের গান)

হেমন্ত ঋতুর আবহমানতায় জীবনানন্দ জগৎ জীবনের ক্ষয়িষ্ণু দিনগুলিকে সদর্থক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পাখিরা' কবিতায় শীতের দেশের পাখিগুলির বসন্তের রাতে পৌঁছানো। 'বিস্ময়' কবিতাতেও জীবনানন্দের বসন্তে উপনীত হওয়ার তীব্র বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে পাখিগুলি ভয়ংকর মৃত্যুর তাড়নার মধ্যেও জীবনের স্বাদ পাবার আকাঙ্খা করেছে —

"মনে হয় কোনো সমুদ্রের মাইলের - মাইলের দূর দিগন্তর
উদ্বেল, নিরপরাধভাবে
জীবনের মতো নীল হয়ে, তবু - মৃত্যুর মতন প্রভাবে।
অন্ধকার ঝড় থেকে অঙ্কে অগণন মেরু পাহাড়ের পাখি
সে তার নিজের বুকে টেনে নিয়ে —
ওই পারে নব বসন্তের দেশে খুলে দিতে চেয়ে ছিলো না কি?"[৪] (বিস্ময় / সা. তা. তি.)

"তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে"[৫] (সূর্যতামসী) অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর শুভ উপস্থিতিতে কবি শুনেছেন সূর্যালোকিত পথে সিন্ধু পাখিদের কলধবনি। মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস আজ অগণন মানুষের মৃত্যুর মাঝে জীবিত না মৃত, ভোর না অনন্ত রাত্রি, সৃজনতা না ভয়াবহতা — এসবের পৃথক অস্তিত্ব নির্দেশ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে এসেও কবির মধ্যে থেকেছে সংশয়ের সুর "ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রিকরোজ্জ্বল"[৬] (সূর্যতামসী। তাই নগর ও গ্রাম হয়েছে নিষ্প্রদীপ। পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম কেবলি ভেঙে যায়। তন্দ্রাহারা মানুষ আলোর কোন ঠিকানা পায়না। যেন, "হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই"[৭] (রাত্রির কোরাস) জীবনানন্দ পৃথিবীর এই কঠিন পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছেন, —

"হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
এরকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায়;"[৮] (নাবিকী/সাতটি তারার-তিমির)

কবির জীবনে কত হেমন্ত অতিক্রান্ত হয়েছে, দেখেছেন কত হেমন্তে মাঠকে বার বার ফসল শূন্য হতে,

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ১৮৩
২। জীবনানন্দ দাশ ঃ সাতটি তারার তিমির / অরুণা প্রকাশনী;কলকাতা - ৬ / সপ্তম মুদ্রণ;ফাল্গুন, ১৪১০ / পৃ. - ৫৩
৩। তদেব;পৃ. - ৫৩
৪। তদেব;পৃ. - ৫৫
৫। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ২৩৩
৬। তদেব;পৃ. - ২৩৩
৭। তদেব;পৃ. - ২৩৪
৮। জীবনানন্দ দাশ ঃ সাতটি তারার তিমির / অরুণা প্রকাশনী;কলকাতা - ৬ / সপ্তম মুদ্রণ;ফাল্গুন, ১৪১০ / পৃ. - ৬২

দেখেছেন উৎপাদিত ফসল সমুদ্রের পারের বন্দরে বাণিজ্যিক মূল্যে কিভাবে বিপনন হয়েছে। ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক - এসব নিয়ে মানুষ কত হিসাব, বোঝাপড়া করেছে। তিনি মনে করেন সময়ের চলমানতায় সমস্ত হেমন্ত ঋতু সময়ের কুয়াশায় বিলীন হয়েছে।

আমরা জানি, কালের নিয়মে অতীত হবে আগামী প্রজন্মের কাছে কঙ্কালের মত। তবে সাহস, সাধ এবং স্বপ্ন নিয়ে প্রাণশিখাকে উজ্জ্বল করতে হবে। হৈমন্তিক ফসল এবং হৃদয়ের স্পন্দনতো সৃষ্টির জয় ঘোষণা করে। হেমন্তের পূর্ণতাই আনে বসন্তের শুভ্র মানবিকতার ভোর। "নব নব মানবের তরে/কেবলি অপেক্ষাতুর হয়ে পথ চিনে নেওয়া" (সময়ের কাছে)। জীবনানন্দ বলেছেন এই হেমন্ত ঋতুর প্রতীক্ষার শেষে তিনি পেয়েছেন উজ্জ্বল দিন। —

"তবুও নবীন নুড়ি — নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী;
জানি আমি জানি আদিনারী শরীরিণীকে স্মৃতির
আজকে হেমন্ত ভোরে।"[১] (জনান্তিকে/সাতটি তারার তিমির)

যদিও কবি জানেন পৃথিবীতে কোথাও সান্ত্বনা নেই আজ। বহু দিন থেকে শান্তির অভাব ঘটেছে পৃথিবাতে। পাখির মতো সহজ সরল হৃদয় নিয়ে পরম শান্তির নীড় তৈরী করতে মানুষ ব্যর্থ হয়েছে। যন্ত্র সভ্যতা, ব্যক্তি স্বার্থ, সাম্রাজ্যবাদ, রাজনীতির কুটিলজালে মানুষ হয়েছে বিশৃঙ্খল, আহত ও মৃত। মানুষ নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করতে গিয়ে তার জনজীবন আরও বিধবস্ত হয়েছে। তাই জীবনানন্দ মানুষের অন্তঃস্থিত বিবেকবোধকে জাগানোর প্রয়োজন বোধ করেছেন। —

"মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল বলে
আজ তার মানবকে কী করে চেনাতে পারে কেউ।"[২] (জনান্তিকে)

মানব হৃদয়ে বসন্তকে আনার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন জীবনানন্দ। তাঁর মতে রক্তাক্ত যুদ্ধে মানুষ হয়েছে আজ সজনহীন নির্জন। ভয় প্রেম জ্ঞান হারিয়েছে রণরক্তাক্ত পৃথিবী। তাই মানুষের মধ্যে "বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই" (উত্তর প্রবেশ)। তবে অগণন মানুষের মৃত্যু দেখেও কবির মনে হয়েছে মানব হৃদয় সুস্থ স্বাভাবিক অনুভূতি নিয়ে আজও বেঁচে আছে। কবির ভাষায় মৃত্যু — "সেই মৃত্যু ব্যসনের মতো মনে হয়। / এছাড়া কোথাও কোনো পাখি / বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই। / তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে।"[৩] (দীপ্তি/সা.তা.তি.) বসন্তের আনন্দ ঘন মুহূর্ত মানুষের মাঝে সঞ্চারিত না হলেও হৃদয়ের দীপ্তি এখনও রয়েছে। মানুষের মধ্যে এখনও মরে যায়নি বিবেকবোধ, মূল্যবোধ। তাই কবি বলতে পেরেছেন, "জয়, অস্তসূর্য, জয়;অলখ অরুণোদয়, জয়।" (সময়ের কাছে)। 'মকরসংক্রান্তির রাতে', 'নাবিক', 'নাবিকী', 'সময়ের কাছে' কবিতাগুলিতে সৃষ্টি থেকে নবসৃষ্টির উন্মাদনায় মানুষেরা যে ক্রম অগ্রসর হয়েছে তা তিনি কবিতায় দেখিয়েছেন। পৃথিবীতে 'এখনগভীর রাত' জেনেও কবি অনুভব করেছেন 'কী এক গভীর সুসময়' আসতে চলেছে। চির আশ্বাসময় কবির আহবান ঃ

"এসো আমরা যে যার কাছে — যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে?"[৪] (সূর্যপ্রতিম/সাতটি তারার তিমির)

১। জীবনানন্দ দাশ ঃ সাতটি তারার তিমির / অরুণা প্রকাশনী;কলকাতা - ৬ / সপ্তম মুদ্রণ;ফাল্গুন, ১৪১০ / পৃ. - ৬৭

২। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-২৩৯

৩। জীবনানন্দ দাশ ঃ সাতটি তারার তিমির / অরুণা প্রকাশনী;কলকাতা - ৬ / সপ্তম মুদ্রণ;ফাল্গুন, ১৪১০ / পৃ. - ৭৪

৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-২৪৫

ক্লান্ত, ছিন্ন সৌন্দর্যের মহাপৃথিবী'র অসংলগ্নতা কাটিয়ে নবপৃথিবীর সন্ধানে নেমেছেন কবি জীবনানন্দ। 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ে এসে এসে কবি দেখলেন 'সূর্য নক্ষত্র নারী' এদের প্রেরণা শক্তি আজও অটুট আছে। এই পৃথিবীতে অফুরাণ প্রাণশক্তি আছে বলেই না অন্ধকার সময়, ক্লান্তিকর শীত অতিক্রম করার ধৈর্য্য পেয়েছে মানুষ। তবে এক সময় অন্যসব প্রেমিকদের মতো কবিও বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। —

"তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিলো
সবচেয়ে আগে, জানি আমি।
সে-দিনো তোমার সাথে মুখ-চেনা হয় নাই।
তুমি যে এ পৃথিবীতে রয়ে গেছো
আমাকে বলেনি কেউ।" [১] (সূর্য নক্ষত্র নারী / বেলা অবেলা কালবেলা)

তবে ধবংসমত্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পথে বিদ্যুতের মতো প্রেমিক কবি অনুভব করেছেন, —

"দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে।"[২] (সূর্য নক্ষত্র নারী)

'শতাব্দী' কবিতায় 'ঋতুর কামচক্রে'র আবর্তনে কবিহৃদয় অনুভব করেছে যে, পৃথিবীতে আলোকস্তম্ভ থাকলেও যুদ্ধে র অন্ধকারে কখনো কখনো "হেমন্তরাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত অধোগামী হয়ে" যায়। অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি হলেও মানব হৃদয়ে ব্যথার কোনো মীমাংসা নাও হতে পারে। "হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক" বলে মনে করেন জীবনানন্দ। পৃথিবীর এই করুণ কঠিন ইতিহাসের ছায়াপাতের দিনে কবি অনুভব করেছেন, "হেমন্ত খুব স্থির সপ্রতিভ ব্যপ্ত।" শান্তি, সহিষ্ণুতা দিয়ে নীড় গড়বার আহবান শুনেছে জ্ঞানী মানুষ। 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ে এসে কবির সংশয়ভরা হৃদয়ে বলেছেন, "আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।"

'সামান্য মানুষ' কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে ঋতু বৈচিত্র্যের চলমানতায় মানুষ তার তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকেশ করেছে। একজন সামান্য মানুষ ছিপ হাতে অধীর হৃদয়ে রোজকার জীবন অতিবাহিত করেছে। কবি দেখেছেন এই সামান্য প্রাপ্তিতেই কিছু মানুষের হৃদয় তৃপ্ত হয়। মাছের হাতনাড়াতেই হেসে খেলে কেটে যায় এদের জীবন। সামান্য এই মানুষগুলো পার্টি-পলিটিক্স, জ্ঞান-বিজ্ঞান - এসবের জটিল জীবনের ঘেরাপাশ থেকে মুক্ত না হলেও আপাতত "তাদের চেয়ে এক তিল অধিক সরল।"[৩] পুকুরে যেমন সব মাছ একই গভীরতায় অবস্থান করে না, — "ভোরের পুকুরে /চাপেলি পায়রাচাঁদা মৌরালা আছে;/উজ্জ্বল মাছের চেয়ে খানিকটা দূরে।" কবি উপলব্ধি করেছেন প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ব্যবধান রয়েছে। "অঘ্রাণের শীত' কিংবা প্রতিটি মাঘের হাওয়া যেমন ফাল্গুনের আগে এসে দোল দিয়ে যায়, তেমনি" মানুষের হৃদয়ানুভবে, কবির হৃদয়ও আন্দোলিত হয় —

"আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান ঃ
মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকালবেলায়;
এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটেগেছে;তবুও আবার কেটে যায়।"[৪] (সামান্য মানুষ/বে. অ. কা.)

১। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চ ম মুদ্রন : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৬৫
২। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-২৫৫
৩। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চ ম মুদ্রন : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৭২
৪। তদেব;পৃ. - ৭২

'বেলা অবেলা কালবেলা'তে জীবনানন্দ তাঁর আপন সত্ত্বা নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। সেখানে নারীই তাঁর ভবিষ্যৎ। নারীই সূর্য, নারীই প্রেম-প্রেরণার আশ্রয়স্থল। সবিতাকল্প নারীরা "প্রেমের বিথার, মহীয়সী, ঠিক এ-রকম আধা নীলের মতো, জ্যোতির মতো"[১]। (নারীসবিতা) 'প্রয়ান পটভূমি'তে নারী প্রেমের প্রতীক। কবি উপলব্ধি করেছেন কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী, মাতঙ্গী, কমলা ও ভৈরবী - দশরূপা নারী জীবনের বিস্তৃত পরিসরে অনুক্ষণ থেকেছে। প্রাণের হিতাহিত কামনায় মহিলা আপন মহিমায় নারীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শরতের ভোরে নারীকে কবি দেখেছেন, —

"অথবা যখন চিল শরতের ভোরে
নীলিমার আধপথে তুলে নিয়ে গেছে
রসুয়েকে ঠোনা দিয়ে অপরূপ চিতলের পেটি, —
সহসা তাকায়ে তারা উৎসারিত নারীকে দেখেছে;
এক পৃথিবীর মৃত্যু প্রায় হয়ে গেলে
অন্য এক পৃথিবীর নাম
অনুভব করে নিতে গিয়ে মহিলার
ক্রমেই জাগছে মনস্কাম;।"[২]

এই নারীকেই কবি অনুভব করেছিলেন "আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা"[৩] সেখানে তিনি বলেছেন, "আমি রোদ কি ধুলো পাখি না সেই নারী?"[৪] (তোমাকে)। পৃথিবীর বিরাট অবক্ষয়ের অধম অন্ধকারে, নিষ্ফলতার ভিতর উজ্জীবিত রয়েছে নারীর ভালোবাসার মধুরতা। আশ্বিনের ভোরে সহনশীল শীত যেমন নদী, শিশির, পাখি, বাতাস, রৌদ্র — বহিঃ প্রকৃতির স্নিগ্ধতা মানব মনকে মরমীয়তা এনে দেয়, তেমনি নারীকে অনুভব করে প্রতিটি মানুষের প্রাণ সফলতা পায়। নারীর শরীর, হৃদয় কিংবা ছায়ার ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বকে সকলে উপলব্ধি করতে চায়। 'প্রিয়দের প্রাণে' কবিতায় শীত ঋতু মৃত্যুচেতনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই শীত মৃত্যুর অনিবার্য পরিণতি হয়ে মানুষের মধ্যে এসেছে। সর্বদা মরণের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও প্রাণে অবিনশ্বর থেকে গেছে - আশা - নিরাশা, সকাল, নদী, নারী - এসকল স্বাভাবিক বিষয় বাসনা। এই সব স্বাভাবিক ধারণা অনুভব করার পর সকলেই বৃহত্তর সত্যের সন্ধানে পৌঁছেছে। যেখানে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা প্রকটিত হয়েছে, —

"বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই, — আমি বলিনা তো।
কারো লাভ আছে, কলেরা; — হয়তো বা ঢের।
ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
পেয়েছি ধবল শব্দ — বাতাস তাড়িত পাখিদের।"[৫] (তার স্থির প্রেমিকের নিকট)

প্রকৃতির উদার স্পর্শ কাম্য হয়েছে মানব জীবনে। ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে উপভোগ করেছেন কবি সমুদ্রের কলধ্বনি। এমনকি কবির মনে হয়েছে — 'গ্লাসিয়ার-হিম' স্তব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষার - ধূসর ঘুমে আচ্ছন্ন হবেন তিনি, অনেকটা মেরু সমুদ্রের মতো।

'অবরোধ', 'প্রয়ান পটভূমি', 'জয়জয়ন্তীর সূর্য', 'হেমন্ত রাতে', 'ইতিহাসযান', 'মহাত্মাগান্ধী' এসব কবিতায় হেমন্ত ঋতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হেমন্তের স্তব্ধতায় কবির হৃদয় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-২৬৯
২। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চ ম মুদ্রন : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৭০
৩। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-২৫২
৪। তদেব;পৃ. - ২৫২
৫। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চ ম মুদ্রন : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৭৪

"পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে - বেজে ওঠে; সুরতান লয় / গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।" একাকীত্বের যন্ত্রনায় দগ্ধ কবিকে রাত্রি এসে ঘুমের জগতে ডেকে নিয়ে যায়। 'অবরোধ' কবিতার কবি বুঝেছেন হেমন্তের উচ্ছলতা স্তব্ধ হলেও শতাব্দীর মেকি অন্ধকার একদিন নিঃশেষ হবে।

হেমন্তের দিন ছিলো উজ্জ্বল, রঙে ভরপুর। কমলা হলুদ রঙের আলো - আকাশ, নদী, নগরী পৃথিবীকে রঙিন করেছিলো। সূর্যকিরণ ঢলে পড়ার পর এখন দিক-দিগন্তে এসেছে অন্ধকার। মানবহৃদয় ও হেমন্তের এই আঁধারে হিম আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যুকীর্ণ, রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে একদিন সৃষ্টি হবে নতুন অমল পৃথিবী। যেখানে থাকবে এক আলোকময় ভোর। হেমন্তের আঁধারের হিমকে অতিক্রান্ত করে 'প্রয়াণ পটভূমিতে' দাঁড়িয়ে কবি সেই আলোকময় ভোরকে দেখেছেন —

"কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনো দিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠের বিকেলে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে,
তাহাকে থামায়ে রাখে।"[১] (জয় জয়ন্তীর সূর্য)

জীবনানন্দ দেখেছেন মানুষের সকল কর্ম, চিন্তার মধ্যে ঋতুচেতনার আলাদা অনুভূতির উপস্থিত ঘটে। কর্ম ও চিন্তা ঋতুর আবেশে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শীতের কুয়াশা, হেমন্তের ম্লান মুখ, চৈত্রের বাতাস এসব অনুভূতি মানুষের প্রাণকে সতেজ করে তোলে। কবিমন আকাশকে তুলনা করেছে জীবনের নীল মরুভূমির উপমায়। অঘ্রাণরাতে কবি দেখেছেন। আমলকি পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রের ভিড়। দেখেছেন পৃথিবীর তীরে ধূসর বাড়ির চিত্র। শীত ঘুমের অন্ধকার কাটিয়ে হেমন্তলক্ষ্মীর সমাবেশ দেখেছেন কবি। পৃথিবীর ধবংসাত্মক অন্ধকারে কবি শুনেছেন মানুষের অস্পষ্ট বিলাপ। "জীবনের হেমন্ত সৈকতে' ভেসে ভেসে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ আলোকমুখী কর্ম ও গান গেয়েছে। "জ্ঞান প্রেম পূর্ণতর মানব হৃদয়" "কেবলি কল্লোল আলো, " উনিশতক অনন্তের জয় হয়ে যেতে পারে," (হেমন্তরাতে) - এমনই ভাবনা প্রকাশ করেছেন জীবনানন্দ। ঋতু অনুরাগী কবি জীবনানন্দকে বিশেষিত করতে সমালোচকেরা তাঁদের স্ব-স্ব মত প্রকাশ করেছেন। করুণাসিন্ধু দাসের 'আলোকের মহাজিজ্ঞাসায় ঃ কবি জীবনানন্দ' গ্রন্থে উল্লিখিত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের মতামতটি এরকম —

"তাঁকে ..... হেমন্তের কবিই বলা চলে। যে বিষণ্ণতা তার মূলধন, যে স্তিমিত নিদ্রাচ্ছন্নতায় তিনি ভ্রান্তিবিলাসী, হেমন্তের আধ-আধ কুয়াশা এবং শ্রান্ত প্রকৃতিই তার যোগ্য প্রতীক। শীত, বসন্ত, হেমন্ত, পাতার বিবর্ণতা, হলুদ খড় শুধু অনিবার্য অবসানের নয়, একটা কালের রিক্ততার চিত্রবহ হয়ে এসেছে আমাদের কাছে। তৎকালীন পৃথিবীর গতি প্রকৃতি ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সঙ্কটকে না বুঝে এবং শ্রেণীশক্তির পারস্পরিকতার দিকে পিছু ফিরে দেখেও না দেখে তিনি এক স্বেচ্ছাচারী আলস্যের গায়ক হয়ে থাকলেন।"[২]

'ইতিহাসযান' - জীবনানন্দের একটি অতীত স্মৃতিচারণের কবিতা। জীবনানন্দ শৈশবের অবাধ উদারতা দিয়ে দেখেছেন আকাশ মাঠ রৌদ্র-নক্ষত্র-এসবকে। বিস্মিত হয়েছেন এই দেখে যে, "মানুষের বাড়ি/রোদের ভিতরে যেন সমুদ্রের পারে পাখিদের / বিষণ্ণ শক্তির মতো আয়োজনে নির্মিত হতেছে"[৩]।

১। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চ ম মুদ্রন : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৭৮
২। করুণাসিন্ধু দাস / আলোকের মহাজিজ্ঞাসায় / ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট / কলকাতা - ৭৩ / প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০০ / পৃ. - ৮১
৩। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চ ম মুদ্রন : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৮৭

হেমন্তের রৌদ্রে-দিনে-অন্ধকারে অতীতের পিতৃপুরুষদের স্মৃতিচারণ করেছেন। কখনো খুব শীতের রাতে প্রকৃতির কোলে দেখেছেন অতীত আর পিতৃপিতামহের স্মৃতির মুখগুলি। কখনো হেমন্তের অপরাহ্নে দেখেছেন, অদৃশ্য সূর্যের উজ্জ্বল আলো। হলুদ রঙের খড়ের প্রতীকের মধ্যে দেখেছেন মানুষের মৃত্যুর রূপ অন্ধকার।

অপরাহ্ন অতিক্রান্ত হয় হেমন্তের। বিকেল আসে নীলমার পথ বেয়ে। বিকেলে হেমন্তের সূর্যের ছবি অন্যরকম প্রতিভাত হয়। তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, ঋতুকাল অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত মানুষের মাটির নীচে ঠাঁই পায়।

"আর কত মানুষ, হারিয়ে ফেলে নিজেরা নিজেদেরকে
অর্ধ সত্যে অর্ধ নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে ঃ
অনেক তরুণী যুবা — যৌবরাজ্য যাহাদের শেষ
হয়ে গেছে — তারাও সেখানে অগণন
চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরো ....."[১] (ইতিহাসযান)

পৃথবীর সত্য অনুসন্ধানের দিনেও কবি সাথে নিয়েছেন হেমন্ত ঋতুকে। আত্মঘাতী মানুষের কাছে হেমন্তের রাত্রি, নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ, প্রেম, শান্তি, আলোর নিশানা দেখায়। মহাত্মাগান্ধীর মতো একজন মানবীয় মহানুভবকে এই হৈমন্তের সমুজ্জ্বল উপস্থিতি শান্তির, সত্যের দিশারী করে তোলে। পৃথিবীর মানুষের প্রতি সকলের যে আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা যেন ফিরে আসে মহাত্মা গান্ধীর পরম বিশ্বাসের গভীরতা নিয়ে। — "চরিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে — মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা করেই ক্ষমতাশীল দেখ;
কবেকার সরলতা আজ এই বেশি শীত পৃথিবীতে - শীত;
বিশ্বাসের পরম সাগর রোল ঢের দূরে সরে চলে গেছে;।"[২] (মহাত্মাগান্ধী)

বিশ্বাসের অভাবকে পৃথিবীর শীত বলেছেন জীবনানন্দ। অবিরল রক্তের শীতলতায় জ্ঞানের গভীরতা উপেক্ষিত হয়েছে। প্রার্থনার মধ্যে একাগ্রতা, বিশ্বাস, শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না মানবহৃদয়। তাই আলোর পথিক মহাত্মার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে শান্তিপ্রিয় মানুষেরা।

জীবনানন্দ দেখেছেন-পৃথিবী, এক দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করছে। কবির ভাষায় 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন', এ পৃথিবীতে প্রেমের দিশারী নারী ও আলোর দিশারী নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটেছে। 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ের আশাবাদী কবি দেখেছেন, অমলভোরে, আশ্বিনের নীলাকাশে স্পষ্টদীপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছে সূর্য। তাঁর মতে পৃথিবীতে অবশিষ্ট কিছুই নেই, তবু থেকে গেছে — "অমল ভোরের বেলা রয়ে গেছে শুধু;/ আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট করে দিয়ে সূর্য আসে;"[৩] (সারাৎসার)।

জীবনানন্দ তাঁর এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে পৃথিবীর সমস্ত ব্যর্থতার মাঝে কিছু সফলতাকে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর আহ্নিক গতির নিয়মে যেমন দিন ও রাত্রি - দুইই প্রতিভাত হয়, তেমনি জীবনের মধুর ইতিহাসের মাঝে মাঝে শীত ঋতুর অসারতার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। দ্রষ্টা কবি জীবনানন্দ বলেছেন —

"ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত অসারতা
নেমে আসে;- চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ রয়ে গেছে তবু,
রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে।"[৪] (পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে)

১। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চ ম মুদ্রন : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৮৭
২। তদেব;পৃ. - ১০২
৩। তদেব;পৃ. - ৯৭
৪। তদেব;পৃ. - ৯৩

কবি আরও জানিয়েছেন কনফুশিয়াস, লেনিন, গ্যেটে, হেল্ডেরলিন, রবীন্দ্র - এদের আলোকিত পথ মানুষকে পৌঁছে দেবে চির সত্যের আশ্রয়ে। নিরুৎসাহ, অন্তহীন অবক্ষয়ের সংগ্রামভূমি শুভ্র আলোকময় পথেই অগ্রসর হবে। সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্তিময় হবে নিখিল ভুবন। ঝর্ণার ফেনা, রৌদ্রে প্রদীপ্ত মানুষের মন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করবে। মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সাহসীরা মেতে উঠবে প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যে। আকাশ পথের বনহংসী, পাখির বর্ণালি, এমন দৃষ্টি আকর্ষণীয় দৃশ্যের বর্ণনা আবার দেখা যাবে। মৃত জনমানবের দেশে, ধূসর মৃত্তিকায় আপ্ত বিশ্বাস নিয়ে সৃষ্টিশীল কৃষাণ ফসল ফলাবে। কবি বলেছেন—

"কখনো ফুরুনো ক্ষেতে দাঁড়ায়েছে
সজারুর গর্তের কাছে;
সেও যেন বাবলার কাণ্ড এক
অঘ্রাণের পৃথিবীর কাছে"[১] (বিস্ময়)

সৃষ্টিশীল কৃষাণ অন্ধকারে ন্যুব্জ পৃথিবীর মৃত্তিকা গর্ভ থেকে ফলাবে ধান। অক্লান্ত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হিম হৃদয়ে জোনাকির আলো অনুভূত হবে। কঠিন রুক্ষ্ম শতাব্দীতে নব নব নগরীতে জেগে উঠবে জীবনোৎসব। ইতিহাস খোঁড়া রাশি রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে শত শত শুশ্রূষার ঝর্ণার জলধবনি উত্থিত হবে। পৃথিবীর মহানীলাকাশে উঠবে রৌদ্রের কোলাহল। সৃষ্টির বঞ্চনা ক্ষমা করে পৃথিবীতে শান্তি ঠিক একদিন ফিরে আসবে। কবি গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলেছেন, —

"শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর - তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে;
কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে;
মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।"[২] (মানুষ যা চেয়েছিল)

এলিয়টের 'The Waste Land' জীবনানন্দের কাছে ন্যুব্জ পৃথিবীর মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে। তবে তিনি আশা করেছেন একদিন পতিত জমিতে ফসল ফলবে। রামপ্রসাদের কথাতে যে আশার সুর ছিল, জীবনানন্দের কবিতায়ও সেই সুর লক্ষণীয়।

জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত ঋতু ও ঋতুবাচক মাসের নাম উল্লিখিত কতগুলি পংক্তি। —

ঝরাপালক ঃ
১। দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি! (আমি কবি, - সেই কবি) পৃ. - ৩
২। —চারিদিক ঘিরে শীতের কুহেলী, (নবনবীনের লাগি) পৃ. - ৪
৩। ধবল কাশের দলে, আশ্বিনের গগনের তলে (কিশোরের প্রতি) পৃ. - ৫
৪। লুটায়ে রয়েছে কোথা সীমান্তে শরৎ — ঊষার শ্বাস! (বেদিয়া) পৃ. - ১১
৫। পক্ষে তব নাচিতেছে লক্ষ্যহারা দামিনী — বৈশাখী! (নাবিক) পৃ. - ১২
৬। নীল নহরের স্বপন দেখে চৈতি চাঁদে জেগে, (সাগর - বলাকা) পৃ. - ১৫
৭। যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিমঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু, ঝরো ঝরো
..... আর ঐ আকাশের পউষ-নীরবতা
..... দিকে দিকে ভাদরের ভিজা মাঠ, — আলেয়ার শিখা!
(একদিন খুঁজেছিনু যারে) পৃ. - ১৮

১। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.- ২৭২
২। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চম মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৯০৭

৮। — মরণের পানে শীত প্রেতপুরে
..... হেমন্তের হিম পথ ধরি,
পউষ আকাশতলে দহি দহি দহি (আলেয়া) পৃ. - ২০

৯। কাঁদছে পাখি পউষনিশির (ছায়া-প্রিয়া) পৃ. - ২৩

১০। চুল যার শাঙনের মেঘ (ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল) পৃ. - ২৫

১১। হেমন্তের হিমমাঠে, (কবি) পৃ. - ২৬

১২। — শীতের কুয়াশা।
..... বৈশাখের বেলাতটে সমুদ্রের স্বর - (সিন্ধু) পৃ. - ২৮

১৩। কবে কোন রুক্ষ কাল - বৈশাখীর ঝড়ে (ডাহুকী) পৃ. - ৩৬

১৪। পাতাঝরা হেমন্তের স্বর (শ্মশান) পৃ. - ৩৬

১৫। হেমন্তের বিদায় - কুহেলি, (পিরামিড) পৃ. - ৪০

১৬। অঘ্রাণে যার ঘ্রাণ পেয়েছিল, — পেয়েছিল যারে 'পোষলা'য়,
সাতাশে মাঘের বাতাসে তাহার দর বেড়ে গেছে দশগুণ, -
.... শীতের বাস্তুভিত ভেঙে আজ এল দক্ষিণা (দক্ষিণা) পৃ. - ৪৫

১৭। — হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড়!
..... — পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া!
(সেদিন এ ধরণীর) -পৃ. - ৪৮

১৮। কোথায় লুটায়ে আছে হেমন্তের দিবাশেষে ঘুমন্তের দেহ!
(ওগো দরদিয়া) পৃ. - ৫০

ধূসর পাণ্ডুলিপি ঃ

১। যখন ঝরিয়া যাব, হেমন্তের ঝড়ে
.... তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত (নির্জন স্বাক্ষর) পৃ. - ৫৫

২। হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে .....
কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুর! (মাঠের গল্প / পেঁচা) পৃ. - ৫৭

৩। শীতরাতে, - মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন! - (সহজ) পৃ. - ৬২

৪। সবচেয়ে শীত, — তৃপ্ত তাই (কয়েকটি লাইন)

৫। হেমন্তের নদী ....
শীতের নদীর বুকে অস্থির হয়েছে যেই ঢেউ (অনেক আকাশ) পৃ. - ৬৭

৬। তারপর, — শীত-হেমন্তের শেষে বসন্তের দিন

৭। অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে, ...
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে! ....
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।
..... কার্তিকের মিঠারোদে .....

হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে .....
হেমন্তের ধান ওঠে ফলে, — ....
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে, (অবসরের গান)

৮। চৈত্রের বাতাস, ...
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই। (ক্যাম্পে)

৯। হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায়, —
বরফের মতো শীত, —
তবু তুমি শীত-রাতে আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে
শীত-রাত বাড়ে আরো, -
শীত মেঘে
হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
সেই পৃথিবীর শীতে
ফাল্গুন - রাতের গন্ধে
শীতের নদীর বুকে
হেমন্ত আসার আগে
ফাল্গুন রাতের গন্ধে ..... (জীবন) পৃ. - ৮৮

১০। অসাড় হয়েছে পাতা শীতে
কার্তিকের শীতে! (প্রেম) পৃ. - ১০২

১১। কার্তিকের ভোরবেলা
অঘ্রাণের মাঝরাতে
মাঠে-মাঠে-আড়ষ্ট পউষে
হেমন্তের রৌদ্রের মতন (পিপাসার গান) পৃ. - ১০৬

১২। ঘুমে চোখ চায়না জড়াতে, —
বসন্তের রাতে .....
কোথাও রয়েছে পড়ে শীতপিছে, আশ্বাসের কাছে (পাখিরা) ১১০

১৩। নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভালো,
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ
দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
ইদুঁর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
বৈশাখ প্রান্তরের সবুজ বাতাসে; (মৃত্যুর আগে) পৃ. - ১১২

রূপসী বাংলা ঃ ১। কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে,
(যতদিন বেঁচে আছি) পৃ. - ১২১

২। ....কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত — শীত হাতখান,
(আকাশে সাতটি তারা) পৃ. - ১২১

৩। .... যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়
কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়
ঝরে পড়ে, (জীবন অথবা মৃত্যু) পৃ. - ১২৩

৪। নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়
(যেদিন সরিয়া যাব) পৃ. - ১২৪

৫। ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে শিয়রে বৈশাখ মেঘ —
(ঘুমায় পড়িব আমি) পৃ. - ১২৪

৬। হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
(আবার আসিব ফিরে) পৃ. - ১২৬

৭। যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়
(যদি আমি ঝরে যাই) পৃ. - ১২৬

৮। ধানী শাল পশমিনা বুকে তার — শরতের রোদের বিলাস
(কোথাও চলিয়া যাব) পৃ. - ১২৮

৯। — মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে;
(গোলপাতা ছাউনির) পৃ. - ১২৯

১০। ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ-অন্ধকারে ফেলিতেছে শ্বাস;
কোন চৈত্রে চলে গেছে সেই মেয়ে—
—অঘ্রাণে যে দান ঝরিয়াছে, (কখন সোনার রোদ) পৃ. - ১৩১

১১। ছড়ায়ে রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন অঘ্রাণে;-
(এই ডাঙা ছেড়ে হায়) পৃ. - ১৩৩

১২। আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে
(এখানে ঘুঘুর ডাকে) পৃ. - ১৩৫

১৩। লক্ষ্মীর বাহন যেই স্নিগ্ধ পাখি আশ্বিনের জ্যোৎস্নার আবেগে
(শ্মশানের দেশে তুমি) পৃ. - ১৩৫

১৪। পউষের ভিজে ভোরে (সোনার খাঁচার বুকে) পৃ. - ১৩৬

১৫। আকাশ প্রদীপ জ্বেলে তখন কাহারা যেন কার্তিকের মাস ...
(কতদিন সন্ধ্যার) পৃ. - ১৩৭

১৬। আমের বউল দিল শীতরাতে; (এসব কবিতা আমি) পৃ. - ১৩৭

১৭। এই শীত র'বে শুধু; (এখানে প্রাণের স্রোত) পৃ. - ১৩৮

১৮। ফেনার মতন ভাসি শীত রাতে
..... শেষ রাতে পৃথিবীর অন্ধকারে শীতে (একদিন যদি আমি) পৃ. - ১৩৯

১৯। — শিশিরের শীত সরলতা (ঘাসের বুকের থেকে) পৃ. - ১৪০

২০। —যখন অঘ্রাণ রাতে ভরা ক্ষেত হয়েছে হলুদ, (এই জল ভালো লাগে) পৃ. - ১৪১

২১। ভালোবাসিয়াছি আমি রাঙা রোদ ক্ষান্ত কার্তিকের মাঠে
(এই পৃথিবীতে আমি) পৃ. - ১৪৪

২২। হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে (কোনোদিন দেখিব না) পৃ. - ১৪৬

বনলতা সেন ঃ ১। কার্তিকের মাসে—
..... শীত আর শিশিরের জল! (কুড়ি বছর পরে) ১৫৩

২। তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ফাল্গুনের চাঁদ। (আমি যদি হতাম) পৃ. - ১৫৬

৩। উড়ুক উড়ুক তারা উপযের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক (বুনো হাঁস) পৃ. - ১৫৭

৪। ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে (শঙ্খমালা) পৃ. - ১৫৮

৫। ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে। (নগ্ন নির্জণ হাত) পৃ. - ১৫৮

৬। ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা। (হরিণেরা) ১৬১

৭। হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরাণ — (বেড়াল) পৃ. - ১৬১

৮। ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম — পউষের রাতে
- হে মাঘনিশীথের কোকিল, (অন্ধকার) পৃ. - ১৬২

৯। কোনো এক শীতের রাতে (কমলালেবু) পৃ. - ১৬৪

১০। আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
হেমন্ত আসিয়া গেছে;— চিলের সোনালির ডানা হয়েছে খয়েরি;
এলোমেলো অঘ্রাণের খড় (দুজন) পৃ. - ১৬৫

১১। নিস্তব্ধ শীতের রাতে দীপ জ্বেলে
সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে (স্বপ্নের ধবনিরা) পৃ. - ১৬৬

১২। — আশ্বিনের এত বড়ো অকূল আকাশে (তুমি) পৃ. - ১৬৮

১৩। পাতা কুটো ভাঙা ডিম — সাপের খোলস নীড় শীত।
(ধান কাটা হয়ে গেছে) পৃ. - ১৬৮

১৪। মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে ঃ (সবিতা) পৃ. - ১৭১

১৫। — অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;
— কিছুক্ষণ অঘ্রাণের অস্পষ্ট জগতে (অঘ্রাণ প্রান্তরে) পৃ. - ১৭৩

মহাপৃথিবী ঃ ১। এইখানে ফাল্গুনের ছায়া—মাখা ঘাসে শুয়ে আছি; (নিরালোক) পৃ. - ১৭৭

২। পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে
..... — পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ (সিন্ধুসারস) পৃ. - ১৭৮

৩। কাল রাতে — ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
— সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের —
(আট বছর আগের একদিন) পৃ. - ১৮৩

৪। এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে,
এদিকে কোকিল ডাকছে — পউষের মধ্যরাতে;
কোনো একদিন বসন্ত আসবে বলে?
কোনো একদিন বসন্ত ছিলো, তারই পিপাসিত প্রচার? (শীতরাত) পৃ. - ১৮৬

৫। শীতের বাতাস নাকে চলে গেলো জানালার দিকে, (স্থবির - যৌবন) পৃ. - ১৮৮

৬। বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কত বার দেখলাম
(আজকের এক মুহূর্ত) পৃ. - ১৮৯

৭। অঘ্রাণের মাঠের মৃত্তিকা (মনোবীজ) পৃ. - ১৯২

৮। জীবনের, মরণের, হেমন্তের এরকম আশ্চর্য নিয়ম;
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা;
(প্রেম অপ্রেমের কবিতা) পৃ. - ২০১

সাতটি তারার তিমির ঃ

১। মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;(ঘোড়া) পৃ. - ২০৫

২। হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল-রাঙা- (গোধূলি সন্ধির নৃত্য) পৃ. - ২০৭

৩। অনেক সময় ধরে চুপ থেকে হেমন্তের জল (হাঁস) পৃ. - ২১৬

৪। হেমন্তের ক্ষেতে কবে হলুদ ফসল ফলেছিলো (চক্ষুস্থির) পৃ. - ২১৮

৫। না জেনে কৃষক চোত- বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে পড়ে
(ক্ষেতে প্রান্তরে) পৃ. - ২১৮

৬। হেমন্তের হলুদ ফসল ফলেছিলো (চক্ষুস্থির) পৃ. - ২১৮

৭। দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে; (স্বভাব) পৃ. - ২২৩

৮। এই সেই সংকল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
(সোনালি সিংহের গল্প) পৃ. - ২২৮

৯। হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক। (তিমির হননের গান) পৃ. - ২৩১

১০। ওই পারে নব বসন্তের দেশে খুলে দিতে চেয়েছিলো না কি? (বিস্ময়) পৃ. - ২৩২

১১। তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে (সূর্যতামসী) পৃ. - ২৩৩

১২। হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই (রাত্রির কোরাস) পৃ. - ২৩৪

১৩। হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
এ রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে (নাবিকী) পৃ. - ২৩৫

১৪। হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল;
— তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে! (সময়ের কাছে) পৃ. - ২৩৭

১৫। ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল বলে
আজকে হেমন্ত ভোরে সে কবের আঁধার অবধি;- (জনান্তিকে) পৃ. - ২৩৯

১৬। মকর'ক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন (মকরসংক্রান্তির রাতে) পৃ. - ২৪১

১৭। বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই। (উত্তর প্রবেশ) পৃ. - ২৪২

বেলা অবেলা কালবেলা ঃ

১। আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হলে (তোমাকে) পৃ. - ২৫২

২। হেমন্তরাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত অধোগামী হয়ে
হেমন্ত খুব স্থির /
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোকভাবি; (শতাব্দী) পৃ. - ২৫৪

৩। যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম, (সূর্য নক্ষত্র নারী) পৃ. - ২৫৫

৪। অথবা যখন চিল শরতের ভোরে (মহিলা) পৃ. - ২৫৯

৫। মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকালবেলায়;
এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
এরকম অঘ্রাণের শীতে
প্রতিটি মাঘের হাওয়া ফাল্গুনের আগে এসে দোলায় যে সব।
(সামান্য মানুষ) পৃ. - ২৬১

৬। ক্রমে শীত, স্বাভাবিক ধারণার মতো এই চিরনগরী (প্রিয়দের প্রাণে) পৃ. - ২৬২

৭। ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
(তার স্থির প্রেমিকের নিকট) পৃ. - ২৬৩

৮। হেমন্তের স্তব্ধতায় পুনরায় করে অধিকার (অবরোধ) পৃ. - ২৬৪

৯। হেমন্তের এই আঁধারের হিম লাগে, (প্রয়ান পটভূমি) পৃ. - ২৬৬

১০। কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনো দিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠের বিকেলে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে (জয়জয়ন্তীর সূর্য) পৃ. - ২৬৭

১১। শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে
হেমন্তলক্ষ্মীর সবশেষ অনিকেত আবছায়া তারাদের ...
এমনই অঘ্রাণরাতে মনে পড়ে — ....
আজ এই শতাব্দীতে সকলেরি জীবনের হৈমন্ত সৈকতে (হেমন্তরাতে) পৃ. - ২৬৮

১২। অঘ্রাণের পৃথিবীর কাছে। (বিস্ময়) পৃ. - ২৭২

১৩। হেমন্তের রৌদ্রে - দিনে - অন্ধকারে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
কখনো শীতের রাতে যখন বেড়েছে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
এইসব বিকেলের হেমন্তের সূর্যছবি — তবু
চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরো (ইতিহাসযান) পৃ. - ২৭৪

১৪। ইতিহাস মাঝেমাঝে এ-রকম শীত অসারতা
— মাঘসংক্রান্তির রাত্রি আজ (পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে) পৃ. - ২৭৯

১৫। আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট করে দিয়ে সূর্য আসে; (সারাৎসার) পৃ. - ২৮৩

১৬। নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ (মহাত্মা গান্ধী) পৃ. - ২৮৭

আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ঃ প্রকাশিত - অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র;জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা সংস্থা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ;মার্চ, ২০০৫।

ঝরাপালক

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
আমি কবি, - সেইকবি			হিঙ্গল মেঘ, বাদল শাঙন দরিয়া, দাদুরি কাঁদানো, ভুই চাঁপা, ভাটিয়াল সুর, গজলগান, পাখির নষ্ট নীড়।
নীলিমা			শঙ্খ শুভ্র মেঘপুঞ্জ, রৌদ্র ঝিলমিল, উষার আকাশ।
নব নবীনের লাগি			ঝড়ের বাতাস, শীতের কুহেলি, অশনির ফণা, বাদলের রঙ্গমল্লী, ঝরাপালকের ঝড়।
কিশোরের প্রতি		আশ্বিন	ধবল কাশের দল, নভোনীল।
মরীচিকার পিছে			কুয়াশা, ম(র হাওয়ার ঝড়, ঝড়ের বাতাস।
জীবন-মরণ দুয়ারে আমার			জাম ফুল, মধু-মালতীর ঝরেপড়া পাপড়ি, ঈদরাত, শতদল, উৎসবলোভী অলি, রোজা।
বেদিয়া	শরৎ		অমল উষার কনক রোদের সিঁথি, শীতল শিরি।
নাবিক		বৈশাখ	টাইফুন-ডঙ্কার, দামিনী-বৈশাখী।
বনের চাতক-মনের চাতক			চাতক, পুবের হাওয়া বাদল।
সাগর বলাকা		চৈত্র	হিমের ঘুণ, মেঘের পার।
চলছি উধাও			ঝড়ের ঝাঁঝ, ম(ঝড়, ঝড়ের ঝুঁটি, খাঁ খাঁ মেঘের পাথার পুরী।
একদিন খুঁজেছিনু যারে	শরৎ হেমন্ত		মালতীলতা, কদম, কেয়াফুল, শেফালি, বাদল, বকের পাখা, কামিনী, কুহেলিকা, মহুয়া, ধুতুরা পাতার, মরমর, ঝরাপাতা।
আলেয়া	শীত হেমন্ত		ভিজামাটি।
অস্তচাঁদে			মেঘবৌ, অবেলার ঝড়, ভী(কপোতীর উড়ু উড়ু
ছায়া-প্রিয়া			ডানা, কদমতলা, অপরাজিতা।
ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল		পউষ	মেঘের বু(জ, চাঁদের লুকো-চুরি খেলা, শাঙনের মেঘ হিমস্তন, হিম রোমকূপ।
কবি	হেমন্ত	পউষ	কুয়াশা, শিশিরের জল, করবী কুঁড়ি, ঝরাপাতা, মরা দরিয়া, জল ডাহুকী, হলুদ পাতা, বাদলের মেঘের আঁধার।
সিন্ধু	শীত		নষ্ট নীড়, ঝরাপাতা, পুবালির হাহা, শীতের কুয়াশা, শিশিরের নিশা, আলেয়ার ভিজামাঠ।
দেশবন্ধু		বৈশাখ	কালবৈশাখী, উত্তাল উর্মি, বাদলের মন্দ্র।

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
বিবেকানন্দ			অ(ণ-রঙিন মেঘ ঝড়-বিদ্যুৎ, বজ্র।
ডাহুকী			কালবৈশাখীর ঝড়, নিরালা দুপুর, আকাশে মন্থর মেঘ, মালঞ্চ, ডাহুকী।
শ্মশান	হেমন্ত		কুহেলির হিমশয্যা,মাধবী, পাতাধরা, হিমবাতায়ন।
মিশর		চৈত্র	চপল হাওয়া।
পিরামিড	হেমন্ত		পাতাঝরা, কুহেলি, মাধবী।
ম(বালু			ঝড়, আগুনদানা।
চাঁদিনীতে			চন্দ্রমল্লীপাঁতি, আপেল ফুল, ভিজামাঠ, পাপিয়ার ডাক, কুয়াশা কালো, মেঘের আসর।
দ(ি ণা	শীত	অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ	দ(ি ণার ফর্দা, শিশির শীর্ণা, হিমানীশীর্ণ, ফাগুয়ার হাওয়া, আমের কুঁড়ি অশোকফুল, পলাশ, হোরী, কুয়াশা।
যে কামনা নিয়ে		পউষ	হোরী
স্মৃতি			ঝড়বাদলের জল, মে(র হিম, ম(র অনল, হাওয়ার ঝড়ে, হিমসরণী।
সেদিন এধরণীর	হেমন্ত	ফাগুন পৌষ	কুয়াশা, হিমমাস, ধূধূমাঠ, ধান(ে ত, কাশফুল, ঋতুরাগ।
ওগো দরদিয়া			শিশিরের দলে, বাসন্তী উৎসব, ফাগরাগ।
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়।			গোধূলি গোলাপি বরণ, রাঙামেঘ, ঝরাফসলের গান।

ধূসর পাণ্ডুলিপি

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
নির্জন স্বা(র	হেমন্ত		হেমন্তের ঝড়, পথের পাতা, শিশিরের জল,
মাঠের গল্প			আকাশে ছড়ায়ে আছে নীল। ন(ত্র মরে যায়।
মেঠো চাঁদ			পোড়োজমি, খড়-নাড়া, মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, ঝরা শস্য, ফসল, কাটার সময়।
পেঁচা	হেমন্ত	অঘ্রাণ কার্তিক	কুয়াশা, হলুদ পাতার ভিড়,
পঁচিশ বছর পরে			জ্যোৎস্নায় ধান(ত্র, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা শিশিরে ভিজে গিয়েছে, শসাফুল, নষ্টশসা, মাকড়সার ছেড়া জাল, হিম আকাশের গায়, ভাসিছে কুয়াশা, হলদে তৃণ।
কার্তিক মাসের চাঁদ			ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ, নিড়ানো মাঠ।
সহজ	শীত		শীতরাত
কয়েকটি লাইন	শীত		ঠাণ্ডাফেনা ঝিনুক, শিশিরের শব্দ
অনেক আকাশ	হেমন্ত শীত		সন্ধ্যার মেঘ, হিম-চোখ, ভোরের রোদে আকাশে মেঘ, ঝড়ের হাওয়া, অশান্ত সাগর, উত্তরের ঝড়, বিদ্যুতের কণা, ফ্যাকাশে মেঘ, পাতার মতন ঝরে যায়, কুয়াশা।
পরস্পর	বসন্ত, শীত, হেমন্ত	মাঘ ফাল্গুন	কাঁচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল, উত্তর সাগর, চাঁপাফুল বকুল।
অবসরের গান	শীত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম	কার্ত্তিক	শিশিরের ঘ্রাণ, পেকে ওঠে ধান, নুয়ে পড়া ফসল, শিশিরের জল, ফলন্ত ধান, কাঁচা বোদ, হেমন্তের নরম উৎসব, কার্তিকের মিঠারোদ, ঝরা মরা শেফালি, সবুজ ঘাস হয়ে গেছে সাদা, ঝরা শিশিরের জল, শীতল চাঁদ, গ্রীষ্মের সমুদ্র।
ক্যাম্পে	বসন্ত	চৈত্র	খাই হরিণীর ডাক।
জীবন	শীত, হেমন্ত	ফাল্গুন	সবুজ পাতা হলুদ হয়, হলদে পাতার মতো পথে ওড়াওড়ি, শাদা হাত, শাদা হাড় বরফের মতো শীত, আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে, ঘূর্ণির মতো বাতাস, উঠাবে পাতার ভিড়, অসুস্থ পাতার মতো দুলে, বৃষ্টি পরে ছেঁড়া ছেঁড়া কালোমেঘ, শস্য ফলে গেছে মাঠে, ফুল ঝরিয়া গেছে, শিশিরের বুকে ঘ্রাণ, হিম হয়ে ঝরে পড়া।

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
১৩৩৩	শীত		ঝরে গেছে তৃণ।
প্রেম		অঘ্রাণ, কার্ত্তিক	পাণ্ডুর পাতা, শিশিরে শিশিরে ইতস্তত, অসাড় পাতা, কুয়াশা, ছেঁড়া পাতা, পশ্চিম মেঘে আসা, পুবের মেঘে রামধনু।
পিপাসার গান	হেমন্ত	কার্ত্তিক, অঘ্রাণ, পউষ	ঝরা শিশিরের গান, অন্ধকারে শিশিরের জল, কুয়াশা, হিম হাওয়া, জুঁই, মুকুল, কুয়াশার ছুরি।
পাখিরা	বসন্ত, শীত		
মৃত্যুর আগে	শীত	পউষ, অঘ্রাণ, বৈশাখ	নিভৃত কুহক, নির্জন খড়ের মাঠ, কুয়াশা, মাঠে ফসল নাই, বহুদিন-মাস-ঋতু।

রূপসী বাংলা

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
সেইদিন এই মাঠ			চালতা ফুল, শিশিরের জলে ভিজিবে না, খেয়া নৌকো।
তোমরা যেখানে সাধ			কুয়াশা, সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে, কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে।
বাংলার মুখ আমি			সোনালি ধান
যতদিন বেঁচে আছি		আশ্বিন	শুকায় পাদ্ম
একদিন জলসিড়ি নদীটির		শ্রাবণ	বটের ঝরা লাল ফল, কদমের বনে, ভাসানের গান, লক্ষ্মীর গল্প।
আকাশে সাতটি তারা	শীত		লাল বটের ফল
কোথাও দেখিনি			হিজলের ক্লান্ত পাতা, বটের অজস্র ফল ঝরে, জলসিড়ি শুকায়নি, বেতের নরমফল।
হায় পাখি, একদিন		আষাঢ়	বাদলের কোলাহল, মেঘের ছায়া, কালীদহের ঝড়।
জীবন অথবা মৃত্যু	হেমন্ত	কার্তিক	অপরাহে(হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায় ঝরে পড়ে, করবী, ভেরেণ্ডা ফুল।
যেদিন সরিয়া যাব		শ্রাবণ	টুপ্ টুপ্ শিশিরের ঝরে পড়া।
পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত			বৈশাখ মেঘ, ধান কাটা হয়ে গেলে, খড় কুড়ানো।
ঘুমায়ে পড়িব আমি		বৈশাখ	আম, কাঁঠালের মধুর গন্ধ।
একদিন	শরৎ		হলুদ বোঁটা শেফালি, কতখানি রোদ - মেঘ।
যখন মৃত্যুর ঘুমে			বঁইচি, শেয়ালকাঁটা, নীরবে ঝরা খয়েরি অশ্বত্থপাতা, আনারসফুল, বাসকের গন্ধ।
আবার আসিব ফিরে		কার্ত্তিক	নবান্ন, কুয়াশা, রাঙা মেঘ।
যদি আমি ঝরে যাই		কার্ত্তিক	নীল কুয়াশা, কাঠাঁলী চাঁপা, হলুদ পাতা, খয়েরিপাতা, শিশিরের গন্ধ, (ে তে ঝরা ধান।
মনে হয় একদিন			পলাশ, লক্ষ্মী পূর্ণিমা।
যে শালিখ মরে যায়			কুয়াশা, কলমীফুল, বিশুষ্ক পদ্মের দীঘি, ভেরেণ্ডার ফুলে গান গায় ভীম(ল।
কোথাও চলিয়া যাব	শরৎ		হলুদ বাদামী পাতা, মাদারের ডুমুর, পরথুপী মধুকূপী ঘাস, রাঙা লিচু।
তোমার বুকের থেকে			হিমের ভিতর, কুয়াশায় ঝরে রূপশাল ধান, অন্ধকারে নিমপেঁচার গান, শূন্যমাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ, কালীদহের ঝড়।

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
গোলপাতা ছাউনির		কার্ত্তিক	কুয়াশা, শুকনো পাতা।
অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া			সতীর শীতল শব কালীদহের ঝড়, বটের সবুজ পাতা, লাল ফল।
ভিজে হয়ে আসে মেঘে		মাঘ	ভিজে মেঘ, কালোমেঘ।
খুঁজে তারে মারো মিছে			নবান্নের ভোর, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ।
পাড়াগাঁর রোদ			শুষ্কপাতা, হলুদপাতা।
কখন সোনার রোদ		চৈত্র অঘ্রাণ	সোনার রোদ নিয়ে গেছে, গরম বাতাস সর্ষের ে ত, ঝরাধান।
এই পৃথিবীতে এক			লক্ষ্মী পেঁচা, ধানের গন্ধ।
কত ভোরে -দু'-পহরে			ময়ূরপঙ্খী, ভোরের সিন্দুর মেঘ।
এই ডাঙা ছেড়ে হায়		অঘ্রাণ	বটের শুকনো পাতা, বাসমতী ধানে ত, অশ্বত্থের পড়ে থাকা পাতা।
এখানে আকাশ নীল		আশ্বিন	সজিনাফুল, আকন্দফুল, কোকিল, কুয়াশা, ধানে ত, আমবন।
কোথাও মাঠের কাছে			দ্রোণফুল, ভাঁটপুষ্প।
এখানে ঘুঘুর ডাকে		আশ্বিন	ে ত ঝরা, কচি কচি শ্যামা পোকাদের ডাক।
শ্মশানের দেশে তুমি		আশ্বিন	রাখি পূর্ণিমা, আকাশে রৌদ্র আর সবুজ মেঘ, অনন্ত সুজ শালি, নীল রূপের কুয়াশা।
তবু তাহা ভুল জানি			বাসমতী ধানগুলো ঝরিছে, প্রান্তরের কুয়াশা।
সোনার খাঁচার বুকে		পউষ	ভিজে ভোর।
কতদিন সন্ধ্যার		কার্ত্তিক	নাটার মতন রাঙা মেঘ, মৌরীর গন্ধমাখা ঘাস।
এ-সব কবিতা আমি		শীত	টুপটুপ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির, কুয়াশা, আমের বউল, আতার হিম ীর।
কতদিন তুমি আমি			কুয়াশা, ছিন্ন ভিজে খড়।
এখানে প্রাণের স্রোত		শীত	নীল কুয়াশা।
একদিন যদি আমি		শীত	
দূর পৃথিবীর গন্ধে			মৌরির মৃদুগন্ধ।
ঘাসের বুকের থেকে		শীত	শিশিরের শীত সরলতা কুয়াশা, পেঁচার নম্রতা, অশ্বত্থ-আম পাতা সারা রাত ঝরে।
এই জল ভালো লাগে		অঘ্রাণ	বৃষ্টির রূপালি জল, ভরা ে ত হয়েছে হলুদ, জামের ডালে পেঁচার নরম হিমগান।

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
একদিন পৃথিবীর পথে			হলুদ ঘাস, হিম প্রজাপতির পড়ে থাকা সুন্দর ক(ণ পাখা।
পৃথিবীর পথে আমি		মাঘ	বৃষ্টি, কুয়াশা।
মানুষের ব্যথা আমি			কুয়াশা, কাশ, রাঙাধান, শালিধান, মরাল-মরালী।
তুমি কেন বহু দূরে			কুয়াশা, বারোমাস।
আমাদের রূঢ়কথা			কুয়াশা, মরালের স্বর, অন্ধ মৃত হিম।
এই পৃথিবীতে আমি		কার্ত্তিক	(ান্ত রাঙা রোদ, কুয়াশা।
বাতাসে ধানের শব্দ			সজনে ফুল চুপে চুপে ঝরে পড়ে বটফলগন্ধ মাখা ঘাস।
একদিন এই দেহ			কুয়াশা, আমমুকুল, পদ্ম।
হৃদয়ে প্রেমের দিন			শালিধান, রূপশালিধান।
কোনোদিন দেখিবনা	হেমন্ত	আষাঢ়	মেঘের রঙ, পথহারা দাঁড়কাক, পাকাধান।
ঘাসের ভিতরে যেই			কুয়াশা।
এইসব ভালোলাগে		পউষ	হিম শিশির।
সন্ধ্যা হয়-চরিদিকে			আঙিনা ভরে গেছে সোনালি খড়ে।
একদিন কুয়াশার			হিম, কুয়াশা, ন্যাড়া অশ্বত্থ, চালতার মরাপাতা।
ভেবে ভেবে ব্যথা পাব			কুয়াশা, ধানের নরম শিষে, মাঠের কুয়াশায় ভাসে সোনালি চিলের ডানা, শিশির।

বনলতা সেন

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
বনলতা সেন			শিশিরের শব্দ।
কুড়িবছর পরে		কার্ত্তিক, শীত	শরকাশ হোগলার মাঠ শিশিরের জল।
হাওয়ার রাত			গভীর হাওয়া, মৌসুমী সমুদ্র, শিশির ভেজা চোখ, কুয়াশা।
আমি যদি হতাম		ফাল্গুন	ধানে(ত, রূপালি শস্য।
হায় চিল			ভিজে মেঘ।
বুনোহাঁস		পউষ	
শঙ্খমালা		অঘ্রাণ	কুয়াশা, কড়ির মত শাদা মুখ, হিম হাত।
নগ্ন নির্জন হাত		ফাল্গুন	
শিকার			হিমের রাতে শরীর 'উম', শুকনো অশ্বত্থ পাতা, সকালের আলোয় টলমল শিশির।
হরিণেরা		ফাল্গুন	শিশিরে পাতায়, হরিণেরা খেলা করে।
বেড়াল	হেমন্ত		বাদামী পাতা।
অন্ধকার		পউষ, মাঘ	কোকিল, হিম হাওয়া।
কমলালেবু	শীত		
দুজন অবশেষে	হেমন্ত	অঘ্রাণ - কার্ত্তিক	লালচে হলদে পাতা জাম-বট-অশ্বত্থের, চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরি শিশিরের জলে, খড়।
স্বপ্নের ধ্বনিরা	শীত		সবুজ পাতা, শান্ত হরিণ, আধো নীল আকাশ।
তুমি		আশ্বিন	
ধান কাটা হয়ে গেছে	শীত		উজ্জ্বল আকাশ।
সবিতা			ধান কাটা হয়ে গেছে, মাঠে পড়ে থাকা খড়,
সুচেতনা	বসন্ত		সাপের খোলস।
অঘ্রাণ প্রান্তরে			
পথ হাঁটা		অঘ্রাণ	শিশির, সমুজ্জ্বল ভোর।
			কুয়াশা, অশ্বত্থ পাতা পড়ে গেছে। বাদামী জীর্ণ।

মহাপৃথিবী

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
নিরালোক		ফাল্গুন	সোনালি খড়, ছায়া মাখা যায়।
সিন্ধুসারস	শীত, হেমন্ত	অঘ্রাণ	কুয়াশা, ঝরা সোনার ধান, হলুদ পাতা, মেঘের দুপুর।
ফিরে এসো			শিশির
শ্রাবণরাত			কালো আকাশ, ধূসর মেঘ
মুহূর্ত			শস্য কেটেছে।
সব			রাঙা মেঘ, বাবলা হোগলা কাশে।
স্বপ্ন			শিশির, কুয়াশা।
আটবছর আগের একদিন	হেমন্ত, শীত	ফাল্গুন	সোনালী রোদ।
শীতরাত	বসন্ত	পউষ	শিশির ঝরা পাতা, হলুদপাতা, কোকিল।
স্থবির যৌবন	শীত		কুয়াশা, কোকিল।
আজকের এক মুহূর্ত	শীত		
ফুটপাতে			গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, ঠাণ্ডাবাতাস, নীল শিশির, গহণ কুয়াশা, হলুদ পেঁপে পাতা।
মনোবীজ		অঘ্রাণ	
পরিচায়ক			কেয়াফুল, শিশিরের মত শব্দ, বরফের মতো সাদা ঘোড়া।
প্রেম অপ্রেমের কবিতা	হেমন্ত		

সাতটি তারার তিমির

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
আকাশলীনা			ন(ত্রের রূপালি আগুনভরা রাত।
ঘোড়া		কার্ত্তিক	হিম
নিরঙ্কুশ			বাণিজ্য বায়ু, ঠাণ্ডা ঘরগুলি
রিষ্টওয়াচ			বিন্দু বিন্দু শিশিরের রাশি, মেঘ, হিম।
গোধূলিসন্ধির নৃত্য	হেমন্ত		বাদামী পাতা
যেইসব শেয়ালেরা			বরফের রাশি জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে।
নাবিক			রাঙা রৌদ্র, নীলিমা
লঘুমুহূর্ত			ধূসর বাতাস
হাঁস	হেমন্ত		
চ(স্থির	হেমন্ত		হলুদ ফসল, সোনালি ফসল
ে(তে প্রান্তরে		চৈত্র - বৈশাখ	মাঠের ফাটল, খড়ের স্তূপ
বিভিন্ন কোরাস	হেমন্ত		হলুদ ফসল, অন্ধকারে পরিত্যক্ত(ে(তের ফসল।
স্বভাব	হেমন্ত		
প্রতীতি			হাওয়ায় উড়ে বাতাবী লেবুর পাতা, বাইরে রৌদ্রের ঋতু।
ভাষিত			রবি ফসল
সৃষ্টির তীরে			কুয়াশা
সোনালি সিংহের গল্প	হেমন্ত		
তিমির হননের গান	হেমন্ত		
বিস্ময়	হেমন্ত		
সৌরকরোজ্জ্বল			উড়ে গেছে পঙ্গপাল, ন(ত্র, নদী, সূর্য, নারী সোনার ফসল।
সূর্যতামসী	বসন্ত		
রাত্রির কোরাস	হেমন্ত		
নাবিকী	হেমন্ত		কুয়াশা
সময়ের কাছে	হেমন্ত, বসন্ত		হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল।
জনান্তিকে	বসন্ত, হেমন্ত		
মকরসংত্র(ান্তির রাত	বসন্ত		মকরত্র(ান্তির রাত
উত্তর প্রবেশ			রৌদ্র রঙ জ্বলে ওঠে

বেলা অবেলা কালবেলা

কবিতার নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
তোমাকে	শীত		
শতাব্দী	হেমন্ত		ঋতুর কামচত্র(মে(ণ রঙের গাছের মর্মর।
সূর্য ন(ত্র নারী	শীত		
মহিলা	শরৎ		
সামান্য	শাত, হেমন্ত	অঘ্রাণ,ফাল্গুন, মাঘ	
প্রিয়দের প্রাণে	শীত	ভাদ্র	
তার স্থির প্রেমিকের নিকট			
অবরোধ	হেমন্ত		
প্রয়ানপটভূমি	হেমন্ত		
জয়জয়ন্তীর সূর্য	শীত , হেমন্ত	চৈত্র	
হেমন্তরাতে	শীত, হেমন্ত	অঘ্রাণ	
নারী সবিতা			শিশির কণা
উত্তর সামরিকী	শীত		কুয়াশা
বিস্ময়			
ইতিহাস যান			হলুদ রঙের খড়
মৃত্যুস্বপ্ন সংকল্প	হেমন্ত, শীত	চৈত্র	হিমের রাতে কুয়াশা, হিমঘুম।
পৃথিবী সূর্যকেঘিরে			অসারতা
অন্ধকার থেকে	শীত	মাঘ	নীলাভ আকাশ, পতঙ্গ, পালক, পাতা শিশির।
একটি কবিতা		আশ্বিন	আলো, শিশির।
সারাৎসার			নীলাকাশ
যতদিন পৃথিবীতে	হেমন্ত, শীত		কুয়াশা
মহাত্মা গান্ধী			শিশির
মহাগোধূলি			সোনালি খড়
মানুষ যা চেয়েছিল			নরম অশ্বত্থ বটের পাতা, সবুজপাতা, হলুদ পাতা।
হে হৃদয়			ঘাসের উপরে শিশির।